BDeBooks.com

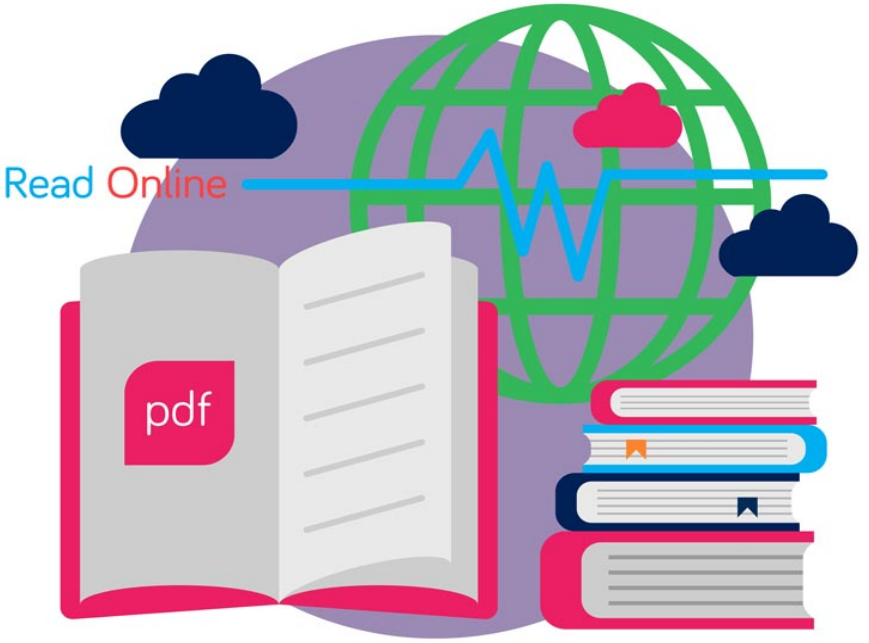

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

নেফ্রুদেৎ-এর সমাধি

ডিসেম্বর ৭

এইমাত্র আমার জার্মান বন্ধু ক্রোলের কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেলাম। ক্রোল লিখছে—

সব কাজ ফেলে কায়রোতে চলে এসো। তুতানখামেনের সমাধির মতো আরেকটি সমাধি আবিষ্কৃত হতে চলেছে। সাকারার দু মাইল দক্ষিণে সমাধির অবস্থান। কায়রোতে কার্নাক হোটেলে তোমার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে রাখছি।

উইলহেল্‌ম ক্রোল

প্রাচীন মিশরের কোনও রাজা বা উচ্চপদস্থ কর্মচারী মারা গেলে মাটির নীচে ঘর তৈরি করে কফিনে তাদের মমি রেখে তার সঙ্গে আরও বেশ কিছু জিনিসপত্র পুরে দেওয়া হত, এটা সকলেই জানে। মিশরীয়রা বিশ্বাস করত মৃত্যুতেও মানুষের জীবন শেষ হয় না, কাজেই দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসের প্রয়োজনও ফুরায় না। তাই খাবার জিনিস, খেলার জিনিস, প্রসাধনের জিনিস, গয়নাগাটি, আসবাবপত্র, জামাকাপড় সবই সমাধিতে স্থান পেত। এরমধ্যে অনেক জিনিসই থাকত যা অত্যন্ত মূল্যবান ; যেমন সোনার উপর পাথর বসানো অলংকার। সোনার তৈরি সিংহাসন পর্যন্ত মিশরের সমাধিতে পাওয়া গেছে। তুতানখামেনের মমির উপরে যে রাজার প্রতিকৃতি সমেত আচ্ছাদন ছিল তার পুরোটাই নিরেট সোনার তৈরি। পৃথিবীতে একসঙ্গে এত সোনা আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

এই সব মূল্যবান জিনিস থাকার দরুন সেই প্রাচীনকাল থেকেই ডাকাতরা সমাধি লুণ্ঠনের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বর্তমানকালে খুব কম সমাধিতেই মূল্যবান কিছু পাওয়া গেছে। এর ব্যতিক্রম হল তুতানখামেনের সমাধি। আশ্চর্যভাবে এই তরুণ সম্রাটের সমাধির উপর ডাকাতের হাত পড়েনি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে হাওয়ার্ড কার্টার যখন এই সমাধি আবিষ্কার করেন,

www.BDeBooks.Com

তখন সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গিয়েছিল এই কারণে যে, এই প্রথম একটি সমাধি পাওয়া গেল যার একটি জিনিসও খোয়া যায়নি।

ক্রোল যে সমাধিটার কথা লিখেছে সেটা সম্বন্ধে ইতিমধ্যে কাগজে পড়েছি। এটা হল আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের এক পুরোহিত ও জাদুকর নেফ্রুদেৎ-এর সমাধি। ইংলন্ডের লর্ড ক্যাভেনডিশ মিশরসরকারের অনুমতি নিয়ে এই সমাধি খননের যাবতীয় খরচ বহন করছেন। ভিন দেশের লোক খননের কাজ চালালেও, খুঁড়ে যা পাওয়া যাবে তার একটা ভাগ মিশরসরকারকে দিতে হবে এই হল নিয়ম। এইভাবেই কায়রোর আশ্চর্য মিউজিয়ম গড়ে উঠেছে। খোঁড়ার কাজ চালাচ্ছেন তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক জোসেফ ব্যানিস্টার। সবেমাত্র একটা ঘর খুঁড়ে বার করার খবর কাগজে বেরিয়েছিল এবং তাতেই মনে হয়েছিল যে, এ সমাধিতে ডাকাতরা কোনও উপদ্রব করেনি। এ খবর তিনদিন আগে কাগজে পড়ি। এর মধ্যে কাজ নিশ্চয়ই আরও অগ্রসর হয়েছে, যদিও এ ধরনের কাজ অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ! আমার দিক দিয়ে এ এক সুবর্ণ সুযোগ। প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে ক্রোলের যথেষ্ট খাতির আছে। সে যখন এই খোঁড়ার কাজে জড়িয়ে পড়েছে, তখন আমারও কোনও অসুবিধা হবার কথা নয়।

এই লর্ড ক্যাভেনডিশ ভদ্রলোকটি যে মিশর সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী, তা নন। তাঁর নানারকম শখ। ইনি ইংলন্ডে বিশাল সম্পত্তির অধিকারী। বিভিন্ন সময়ে নানান ব্যাপারে ইনি পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তারমধ্যে ব্রেজিলে ও নিউগিনিতে দুটি অভিযানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

জোসেফ ব্যানিস্টার সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকুই জানি যে তার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং সে মিশর সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ।

আমি তিনদিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছি। মিশর সম্বন্ধে আমার চিরকালের কৌতূহল। এই বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত বোধ করছি।

ডিসেম্বর ১২, কায়রো

এখন রাত সাড়ে এগারোটা। আমি কার্নাক হোটেলের ৩৫২ নম্বর ঘরে বসে আমার ডায়রি লিখছি। গতকাল সকালে আমি কায়রো পৌঁছেছি। ক্রোল গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ফেরার পথেই এই তিন দিনের খবর পেয়ে গিয়েছিলাম। এই সমাধিতে যে চোরের হাত পড়েনি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে সমাধির প্রবেশপথটা কয়েকটা বড় পাথরের নীচে চাপা পড়েছিল। জোসেফ ব্যানিস্টার নেফ্রুদেৎ-এর কথা জানত এবং বিশ্বাস করত তার একটা সমাধি নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। সে অনেক খোঁজার পর প্রায় হাল ছেড়ে দেবার মুখে একটা শেষ চেষ্টা দেবার জন্য ওই পাথরগুলো সরাতে বলে। পাথর সরাতেই বোঝা যায় সেখানে একটা কিছু রয়েছে। একটু খোঁড়াখুঁড়ি করেই দেখা যায় যে সেটা একটা প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বার মানেই যে সমাধির প্রবেশদ্বার, এ বিষয়ে ব্যানিস্টারের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না, কারণ প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের উপরে প্রাচীন মিশরীয় লিপিতে নেফ্রুদেৎ-এর নাম লেখা ছিল।

ব্যানিস্টার এটা দেখামাত্র ইংলন্ডে লর্ড ক্যাভেনডিশকে টেলিফোন করে। ক্যাভেনডিশ তাকে খননের কাজ চালিয়ে যেতে বলেন, এবং আশ্বাস দেন যে টাকার কোনও অভাব হবে না।

কাল দুপুরে ক্রোলের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম খোঁড়ার জায়গায়। ব্যানিস্টারের সঙ্গে

আলাপ হল। বেশ চালাকচতুর, এবং খুব উৎসাহী। সে এখন চরম উত্তেজনা বোধ করছে। তার বিশ্বাস সে তুতানখামেনের মতোই এক সমাধি আবিষ্কার করতে চলেছে, যদিও তুতানখামেন ছিল সম্রাট আর নেফ্রুদেৎ পুরোহিত ও জাদুকর।

প্রথম যে ঘরটা খোলা হয়েছে তাতে বিস্তর জিনিস পাওয়া গেছে, তারমধ্যে আসবাব আর দেবদেবীর মূর্তিই বেশি। কারুকার্য অতি উঁচু দরের। এরমধ্যেই নানান দেশ থেকে সাংবাদিকরা আসতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের অবশ্য সমাধিকক্ষের ভিতর ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এবং হবেও না। তারা যা খবর নেবার বাইরে থেকেই নিচ্ছে।

ক্রোল একটা কাজের কাজ করেছে। তার সঙ্গে ব্যানিস্টারের পরিচয় বেশ কিছুদিন থেকেই। সে ব্যানিস্টারকে বলে অনুমতি জোগাড় করে নিয়েছে যাতে খোঁড়ার সময় আমি আর ক্রোল দুজনেই কক্ষের মধ্যে থাকতে পারি। প্রথম কক্ষের জিনিসপত্রে নম্বর লাগিয়ে, তাদের ছবি তুলে অতি সন্তর্পণে তাদের পাঠানো হচ্ছে ল্যাবরেটরিতে পবিষ্কার করার জন্য।

প্রথম কক্ষের পিছন দিকে একটা সিলমোহর দিয়ে বন্ধ করা দরজা রয়েছে। সেটা যে আরেকটা ঘর তাতে সন্দেহ নেই। তাতে আবার কী আশ্চর্য সম্ভার লুকিয়ে আছে কে জানে!

ডিসেম্বর ১৫

আজ দ্বিতীয় ঘরটা খোলা হল। ব্যানিস্টার প্রথমে একা কিছুক্ষণ টর্চ নিয়ে ঘরটা ঘুরে দেখল। আমরা দুজন বাইরে অপেক্ষা করলাম। কদিনের মধ্যেই এইসব ঘরে ইলেকট্রিক কানেকশন বসে যাবে, তখন আর সবসময় টর্চের দরকার হবে না। একটু পরেই আমাদের ডাক পড়ল। ব্যানিস্টার উত্তেজিত স্বরে বলল, 'এ ঘরেও প্রচুর জিনিস। কাস্কেটের সংখ্যাই এগারোটা—তারমধ্যে ছোট বড় সব রকমই আছে। আর কাস্কেট মানেই সেগুলো জিনিসে ভরা।'

তুতানখামেনের সমাধির কাস্কেট বা বাক্স দেখেছি। কাঠ, হাতির দাঁত আর অ্যালাব্যাস্টারের তৈরি। বাক্সগুলোর বাইরে সর্বাঙ্গে অপূর্ব কারুকার্য। এগুলোও দেখলাম সেরকমই ব্যাপার। কিন্তু এ ছাড়াও কিছু জিনিস দেখা যাচ্ছে যেগুলো তুতানখামেনের সমাধিতে দেখা যায়নি। সেগুলো বেশির ভাগই কাঠ বা হাড়ের তৈরি। ক্রোল বলল, 'আমাদের ভুললে চলবে না যে আমরা কোনও সম্রাটের সমাধি দেখছি না। নেফ্রুদেৎ ছিলেন পুরোহিত ও জাদুকর। জাদুসংক্রান্ত অনেক কিছু জিনিসই এখানে পাবার কথা।'

আমাদের দৃষ্টি গিয়েছিল একটা বড় বাক্সের দিকে, অ্যালাব্যাস্টারের তৈরি। ব্যানিস্টার বলল, 'এবার এটাকে খুলব, কিন্তু কাজটা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ, বাক্সটার চারপাশে হাতে আঁকা ছবি রয়েছে। তাড়াহুড়ো করলে সেগুলোর রং খসে আসতে পারে।'

এইবার ব্যানিস্টারের ধৈর্যের নমুনা দেখলাম। ছেলেটিকে যত দেখছি ততই ভাল লাগছে। আধ ঘণ্টা ধরে পরিশ্রম করে একটিও নকশা স্থানচ্যুত না করে সে বাক্সের ডালাটা খুলল। তারপর তারমধ্যে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল সেটা নানারকম গয়না, ভাঁজ করা কাপড়, ছোট মূর্তি ইত্যাদি জিনিসে ভর্তি।

টর্চের আলোয় একটা ব্যাপার দেখে একটু অবাক হলাম। বাক্সের ভিতরে কী একটা জিনিস যেন অস্বাভাবিক রকম ঝলমল করছে। সেটা সোনা নয়; সেটা যে একটা পাথর তাতে কোনও সন্দেহ নেই, এবং সেটা একটা গয়নার মধ্যে বসানো।

আমি ব্যানিস্টারকে প্রশ্ন করলাম, 'ঝলমলে জিনিসটা কী বুঝতে পারছ?'

www.BDeBooks.Com

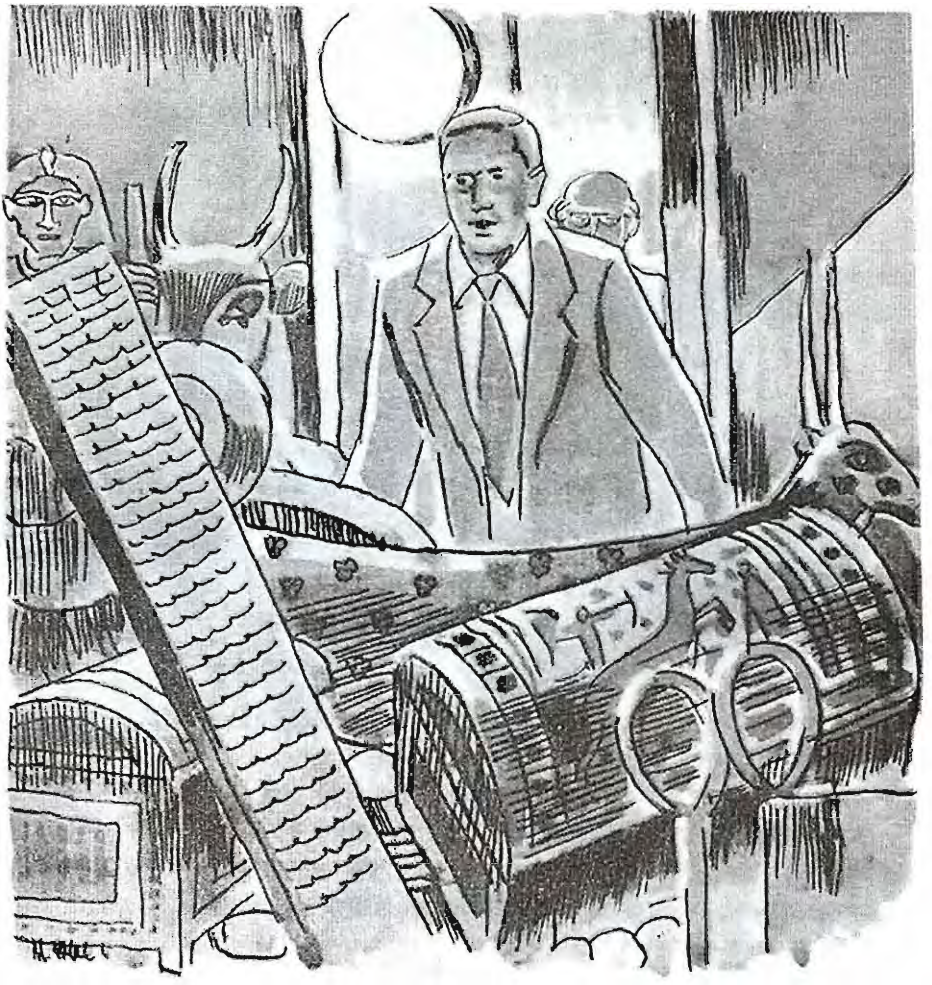

ব্যানিস্টার বলল, 'মিশরে প্রাচীনকালে গয়নায় সোনার সঙ্গে যে সব পাথর ব্যবহার হত সেগুলো সেমি প্রেশাস স্টোনস। অর্থাৎ সেগুলো মহামূল্য রত্ন নয়। কারনেলিয়ান, অ্যামেথিস্ট, অবসিডিয়ান—এইসব জাতীয় পাথর। তার থেকে তো এত দ্যুতি বেরোয় না।'

'তা হলে ?'

'একটু ধৈর্য ধরতে হবে,' বলল ব্যানিস্টার। 'তোমরা বরং বাইরে অপেক্ষা করো। আমি এই বাক্সের জিনিসগুলো একে একে বার করি। আর, ভাল কথা, এই পাথর সম্বন্ধে যেন বাইরের কেউ না জানে। বিশেষ করে সাংবাদিকরা।'

আমরা দুজন বাইরে চলে এলাম। লাঞ্চের সময় হয়েছিল, কাজেই সে কাজটাও সেরে নেওয়া হল। সাংবাদিকরা আমাদের কাছ থেকে খবর বার করার বহু চেষ্টা করেছিল, আমরা মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইলাম। ব্যানিস্টার না বলা পর্যন্ত আমরা কোনও কথা ফাঁস করছি না।

আজ মনে হয় আর কোনও ঘটনা ঘটবে না, কারণ কাস্কেটের জিনিস বার করতে ব্যানিস্টারের সময় লাগবে। এই সাবধানতার ব্যাপারটা এখানে না এলে বুঝতে পারতাম না। শুকনো বালির দেশ বলেই এসব জিনিস এখনও রয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও হলে এতদিনে সব ধুলো হয়ে যেত।

মিশরসরকার থেকে ডাঃ আবদুল সিদ্দিকি বলে এক প্রত্নতাত্ত্বিকও আজ থেকে ব্যানিস্টারকে সাহায্য করছেন। লর্ড ক্যাভেনডিশ এখনও ইংলন্ডে ; তবে উনি বলেছেন খবর দিলেই চলে আসবেন।

ডিসেম্বর ১৬

এর চেয়ে আশ্চর্য খবর আর হতে পারে না। কাল যে জিনিসটাকে কাস্কেটের মধ্যে চকচক করতে দেখেছিলাম, সেটা হল হিরে। হ্যাঁ, হিরে—যার সঙ্গে মিশরের সম্পর্ক ছিল না কোনওদিন। ঈজিপ্টে হিরে পাওয়া আর আফ্রিকার জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পাওয়া একই জিনিস। ইতিহাসের গোড়ার দিকে হিরে ছিল ভারতবর্ষের একচেটিয়া সম্পত্তি। বহুকাল থেকে ভারতবর্ষে হিরের খনিতে কাজ হয়ে আসছে। পশ্চিমে তখন যে হিরে গেছে, সবই ভারতবর্ষ থেকে। বহু পরে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিরে আবিষ্কার হয় দক্ষিণ আমেরিকায় আর দক্ষিণ আফ্রিকাতে। আজকাল ভারতবর্ষে হিরের উৎপাদন কমে গেলেও

www.BDeBooks.Com

কোহিনূর থেকে আরম্ভ করে যে সব বিখ্যাত হিরের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশেরই উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ।

কিন্তু ঈজিপ্টে হিরে! এ যে তাক লাগানো ব্যাপার! কাস্কেটের গয়নার মধ্যে যে হিরে পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই মটরদানার সাইজের, দু একটা একটু বড়। সেগুলো সবই প্রায় সোনার মধ্যে বসানো। ল্যাবরেটরিতে এই হিরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে কোনও খুঁত নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিরের সঙ্গে এর তুলনা চলে। কাঠিন্যে আর ঔজ্জ্বল্যে এ হিরে প্রথম শ্রেণীতে পড়ে।

বলা বাহুল্য খবরটা দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মিশরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে এমন তাজ্জব ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। কোত্থেকে এ হিরে এল, কী করে এল, সেটা কেউই অনুমান করতে পারছে না। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কের কথাও উঠেছে, কিন্তু সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে সোনা ছিল, এমন কোনও নজির ইতিহাসে নেই।

লর্ড ক্যাভেনডিশ খবর পাওয়ামাত্র কায়রোতে চলে এসেছেন। আজ আমাদের সঙ্গে আলাপ হল। বছর পঞ্চাশ বয়সের সুপুরুষ ভদ্রলোক, এখন মহা ফুর্তিতে আছেন। এসেই আজ রাত্রেই একটা বড় পার্টি দিলেন কার্নাক হোটেলে এই যুগান্তকারী ঘটনা সেলিব্রেট করার জন্য। মিশরে এখন টুরিস্ট সিজন, তাই লোক হয়েছিল অনেক।

এখন পর্যন্ত হিরে সমেত সাতটা গলার হার আর তিন জোড়া কানের গয়না পাওয়া গেছে। আরও অনেক কিছু পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা। এখনও আসল সমাধি কক্ষ—যাতে নেফ্রুদেৎ-এর মমি থাকার কথা—সেটাই খোলা হয়নি। আমি পার্টিতে ব্যানিস্টারের সঙ্গে এই ঘটনা নিয়ে কথা বললাম। সে একেবারে হতভম্ব। এই হিরে আবিষ্কারের ফলে মিশর সম্পর্কে এমন একটা নতুন দিক খুলে গেছে, যেটা সম্পর্কে আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। অথচ ব্যাপারটা রহস্যময়। ব্যানিস্টার বলল, 'ঈজিপ্টের সঙ্গে কার্বনের কোনও সম্পর্ক ইতিহাসে পাওয়া যায়নি। কয়লা এদেশে কোনওদিন ছিল না। অথচ হিরের মূলে হল কার্বন। আমি এর কোনও কূলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না।'

আগামী কাল একটা নতুন ঘর খোলা হবে। আশা করছি এটাই হবে প্রধান সমাধিকক্ষ—এবং নেফ্রুদেৎ-এর কফিনও এখানেই পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে হিরের খবরটা অবিশ্যি পৃথিবীর সব কাগজেরই প্রথম পাতায় বেরিয়ে গেছে। খোঁড়ার জায়গায় ভিজিটরের সংখ্যাও ভয়াবহ রকম বেড়ে গেছে। তবে হিরে পাওয়ার পর থেকেই মিশর সরকার খোঁড়ার জায়গায় পুলিশের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন কেবল লর্ড ক্যাভেনডিশ, তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর আমাদের দুজনকে ছাড়া বাইরের লোক আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।

ডিসেম্বর ১৭

আজ সকালে একটা ঘটনার কথা শুনলাম যার সঙ্গে এই প্রত্নতাত্ত্বিক খননের কোনও সম্পর্ক না থাকলেও, এটাও হিরে সংক্রান্ত।

তিন মাস আগে হোটেল কার্নাকে লর্ড ও লেডি এইন্‌সওয়র্থ নামে ইংলন্ডের বিশেষ সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক দম্পতি এসেছিলেন কিছুদিনের জন্য। লেডি এইন্‌সওয়র্থের একটি বহুমূল্য হিরের হার ছিল, যার প্রধান হিরেটি একটি আঙুরের মতো বড়। এই হোটেল থেকেই সেই হারটি চুরি যায়, এবং সেইসঙ্গে লর্ড এইন্‌সওয়র্থের ভৃত্য ফ্রানসিসকেও আর পাওয়া যায়

না।

পুলিশ অনুমান করে এটা বিখ্যাত গ্রিক হিরে চোর ডিমিট্রি ম্যাক্রোপুলসের কীর্তি। তাকে নাকি এই ঘটনার তিনদিন আগে কায়রোতে দেখা গিয়েছিল। ম্যাক্রোপুলস দুবার জেল খেটেছে। কিন্তু তাতেও তার সংস্কার হয়নি। ম্যাক্রোপুলস এইন্‌সওয়র্থের চাকর ফ্রানসিসকে মোটা ঘুষ দিয়ে হিরের হারটি আদায় করে। তার ফলে ফ্রানসিসকেও পালাতে হয়। এখন হিরেই হচ্ছে একমাত্র আলোচ্য বস্তু। তাই আমাদের হোটেলে এক ফরাসি ভদ্রলোক আমাদের এই কাহিনীটা শোনালেন। মনে মনে বললাম, ভাগ্যিস নেফ্রুদেৎ-এর সমাধিতে ডাকাত পড়েনি, তা হলে তারা দাঁও মারত ভালই।

আজ দুপুরে দুটোর সময় তৃতীয় ঘরের দরজার সিল ভাঙা হল। যা অনুমান করা হয়েছিল, তাই। এটাই হল প্রধান কক্ষ, আর এখানেই রয়েছে নেফ্রুদেৎ-এর শবাধার।

শবাধারটি বিশাল। তার চার পাশে নানারকম ছোটখাটো কাঠের আসবাব ইত্যাদি জমে ছিল ; প্রথমে সেগুলোকে ঘর থেকে বার করা হল। এতে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই নেই।

স্থির হল কাল সকালে নেফ্রুদেৎ-এর শবাধার খোলা হবে। সচরাচর এই কফিনগুলোতে প্রথমে থাকে একটা বাইরের কাঠের আবরণ। সেটাকে খুললে পরে বেরোয় কারুকার্য করা মামির আবরণ, যেটার উপরের দিকে থাকে মৃত ব্যক্তির প্রতিকৃতি। তার নীচে থাকে বুকের উপর জড়ো করা হাত, আর তার নীচে শরীরের নীচের অংশ আর পা। এই মূর্তির সর্বাঙ্গে থাকে কারুকার্য এবং এতে সোনার অংশ থাকার সম্ভাবনাও বেশি।

কাল দুপুরের মধ্যে নেফ্রুদেৎ-এর কফিন খোলা হয়ে যাবে বলে আমার ধারণা।

ডিসেম্বর ১৮

আজ আরেক চমক।

নেফ্রুদেৎ-এর মামির আবরণে তার প্রতিকৃতির গলায় একটি হার পাওয়া গেছে যাতে একটি অসামান্য দ্যুতিসম্পন্ন হিরে রয়েছে। ব্যানিস্টার আমাদের প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই ঢুকেছিল এই কক্ষে। তারপর সে ডাকায় প্রথম গেলেন লর্ড ক্যাভেনডিশ ও তাঁর দুই বন্ধু, তারপর আমরা দুজন। ক্যাভেনডিশ একটি মন্তব্য করলেন যেটা আমার মোটেই ভাল লাগল না। তিনি কিছুক্ষণ কফিনের গলার হিরেটার দিকে চেয়ে বললেন, 'আই মাস্ট সে ইট লুক্‌স এগজ্যাক্টলি লাইক লেডি এইন্‌সওয়র্থস ডায়ামন্ড।'

এটা বলার অবিশ্যি একটা কারণ আছে। মিশরীয়রা সেই যুগেই হিরেতে পল কাটতে শিখেছিল—যেটা ভারতবর্ষ কোনওদিনও রপ্ত করতে পারেনি। এই হিরেটাও তাই দেখে আজকালকার হিরে বলেই মনে হয়। ক্রোল আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'ম্যাজিক, ম্যাজিক—এ সবই ম্যাজিক।' ম্যাজিক, ভোজবাজি ইত্যাদিতে বিশ্বাসী ক্রোলের মতো ইউরোপে আর দ্বিতীয় কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না। এই হিরে তৈরির ব্যাপারে জাদুর যে একটা ভূমিকা আছে, সে বিষয় ক্রোল নিঃসন্দেহ। শুধু রাসায়নিক ব্যাপারে এটা সম্ভব হয়েছে সেটা ক্রোল মানতে চায় না।

মোটকথা এই সাড়ে তিন হাজার বছর আগের হিরে আমাকে যে চমক দিয়েছে, তেমন আর কিছু দিয়েছে বলে মনে পড়ে না।

www.BDeBooks.Com

ডিসেম্বর ১৯

আজ তুমুল কাণ্ড। এরকম যে হবে তা ভাবতে পারিনি।

নেফ্রুদেৎ-এর কণ্ঠহারের হিরে দেখে কায়রো পুলিশ বলেছে সেটা নাকি লেডি এইন্‌সওয়র্থের নেকলেসের হিরে। এই হিরের একটা ছবি তুলে তৎক্ষণাৎ নাকি লেডি এইন্‌সওয়র্থের কাছে পাঠানো হয়েছিল, এবং তিনিও সেটাকে তাঁর নিজের হিরে বলে চিনতে পেরেছেন। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মিশরে হিরে তৈরির ব্যাপারটা নাকি সম্পূর্ণ ধাপ্পা।

সমস্ত ব্যাপারটা কী করে সম্ভব হয় সেটারও একটা বিবৃতি পুলিশ দিয়েছে। যেদিন লেডি এইন্‌সওয়র্থের গলার হার চুরি হয় সেদিন নাকি ম্যাক্রোপুলস কায়রোতে ছিলই না। সে ছিল অ্যাথেনসে। এ ব্যাপারে তার অকাট্য অ্যালিবাই রয়েছে। অর্থাৎ এই বিশেষ হিরে চুরির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্কই নেই। পুলিশ তাই একটা নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। চুরির সময় ব্যানিস্টার কায়রোতে ছিল এবং কার্নাক হোটেলেই ছিল। সে-ই এইন্‌সওয়র্থের চাকরকে ঘুষ দিয়ে নেকলেসটা চুরি করে তাই দিয়ে ঈজিপ্‌সিয়ান ধাঁচের গয়না বানিয়ে নেফ্রুদেৎ-এর সমাধিতে পুরেছে। উদ্দেশ্য হল একটা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করা। হাওয়ার্ড কার্টার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তুতানখামেনের সমাধি খুঁড়ে বার করে। ব্যানিস্টার চেয়েছিল কার্টারকেও টেক্কা দিতে।

এদিকে আরেকটা ব্যাপার হয়েছে। আমেরিকার ডি বিয়ারস কোম্পানি সারা বিশ্বের হিরে বেচাকেনা কনট্রোল করে! সেই কোম্পানি থেকে লোক এসেছে ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার জন্য। কৃত্রিম উপায়ে সহজে হিরে তৈরি করতে পারলে হিরের ব্যবসা লাটে উঠত। অবিশ্যি তারা যখন শুনল নেফ্রুদেৎ-এর হিরে আসলে লেডি এইন্‌সওয়র্থের হিরে, তখন তারা আশ্বস্ত হল।

ব্যানিস্টারকে পুলিশ প্রচণ্ডভাবে জেরা করছে। কায়রো পুলিশ নাকি এ ব্যাপারে একেবারে নির্মম। লর্ড ক্যাভেনডিশ একদম ভেঙে পড়েছেন। তাঁর মন বিশ্বাস অবিশ্বাসের মধ্যে দোলায়িত হচ্ছে। তিনি আমাকে বললেন যে, ব্যানিস্টার নাকি ভীষণ উচ্চাভিলাষী ছিল, যদিও কাজের দিক দিয়ে তার ওপর কোনও সন্দেহ করা চলতে পারে না। আমি আর ক্রোল দুজনেই বিশ্বাস করি যে ব্যানিস্টার নির্দোষ, কিন্তু সেটা আমরা প্রমাণ করছি কী করে? সে যদি সত্যিই লেডি এইন্‌সওয়র্থের হিরে চুরি করে থাকে এবং তাই দিয়ে ঈজিপ্‌সিয়ান ধাঁচের গয়না তৈরি করে থাকে, তা হলে সেগুলো কাস্কেট ইত্যাদির মধ্যে রাখবার সুযোগ তার ছিল, কারণ রোজই সে প্রথমে একাই সমাধিকক্ষে প্রবেশ করেছে। তারপর আমরা দুজন গেছি। পরিস্থিতি খুব অস্বস্তিকর। এ অবস্থায় কী করা উচিত তা ভেবে স্থির করা খুব মুশকিল।

এদিক খোঁড়ার কাজ তো বন্ধ রাখা যায় না, তাই সে কাজটা এখন চলছে ডাঃ সিদ্দিকির তত্ত্বাবধানে। লর্ড ক্যাভেনডিশও এ ব্যাপারে রাজি হয়ে গেছেন। সিদ্দিকির সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছিল, কাজেই আমাদের পথ খোলাই আছে। এখন কথা হচ্ছে—আরও হিরে যদি বেরোয়, তা হলে সেটা কার বলে প্রতিপন্ন হবে? তখন কি ব্যানিস্টারকে একটি পাকা হিরে চোর হিসেবে দাঁড় করানো হবে?

কিন্তু আমার মন বলছে আর হিরে বেরোবে না! সেখানেই মুশকিল। এ কদিনে গয়না যা বেরিয়েছে তার পরিমাণ কিছু কম নয়। এদিকে আর হিরে না বেরোলে ব্যানিস্টারকে বাঁচানো আমাদের পক্ষে সত্যিই মুশকিল হবে।

ডিসেম্বর ২০

আজ আর ডায়রি লিখতেও মন চাইছে না।

পুলিশের নির্মম জেরায় ব্যানিস্টার তার অপরাধ মেনে নিয়েছে। এবারে তার যা শাস্তি হবার তা হবে। আমার আর এখানে এক দিনও থাকতে ইচ্ছে করছে না। ক্রোলেরও প্রায় একই অবস্থা, তবে আজ একটা চতুর্থ ঘর—এটা ছোট—খোলা হয়েছে, তাতে ম্যাজিক সংক্রান্ত অনেক রকম জিনিস রয়েছে। ক্রোল বলছে, সে ঘরটা একবার দেখেই চলে যাবে। আমিও তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছি।

ডিসেম্বর ২২

আমাদের এই ঘটনার পরিসমাপ্তি যে এইভাবে হবে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আগেই বলেছি যে চতুর্থ ঘরে ম্যাজিক সংক্রান্ত জিনিসই ছিল বেশি, তার মধ্যে প্রধান হল মড়ার মাথার খুলি আর জন্তুজানোয়ারের হাড়। সে সমস্ত বাইরে পাঠিয়ে দেবার পর ঘর যখন অপেক্ষাকৃত খালি হয়ে এল, তখন আমাদের তিন জনেরই চোখে পড়ল একটা মাঝারি সাইজের অ্যালাব্যাস্টারের কাস্কেট।

যথারীতি সন্তর্পণে কাস্কেটটা খুলে সিদ্দিকি বললেন, 'এতে একটা প্যাপাইরাসের স্ক্রোল দেখছি।'

প্যাপাইরাস গাছের পাতা শুকিয়ে প্রাচীন মিশরীয়রা সেটাকে কাগজের মতো করে ব্যবহার করত। প্যাপাইরাস থেকেই ইংরিজিতে পেপার কথাটা এসেছে। এই প্যাপাইরাস পর পর জুড়ে তা দিয়ে একটা লম্বা কাগজের মতো তৈরি করে তাতে কলম দিয়ে লিখে সেটাকে পাকিয়ে রাখা হত। সেইরকম পাকানো কাগজকেই বলে স্ক্রোল। এই স্ক্রোল অতি সাবধানে খুলে টেবিলের উপর পেতে তার উপর একটা কাচের শিট চাপা দিয়ে প্যাপাইরাসের লেখা পড়া হত। বলা বাহুল্য এই লেখা হল সেই প্রাচীন মিশরীয় লিপি হিয়েরোগ্লিফিক্স। এই ভাষা সিদ্দিকি, ক্রোল এবং আমি তিনজনেই পড়তে পারি।

তিন ঘণ্টা লাগল এই প্যাপাইরাসকে সমান করে বিছোতে।

তারপর তিনজনে মিলে ধীরে ধীরে তার লেখা পড়লাম।

পড়তে পড়তে উত্তেজনায় আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। শেষ যখন হল, তখন আমাদের সকলেরই কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, আর হৃৎস্পন্দন বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ।

প্যাপাইরাসের নীচে নাম রয়েছে নেফ্রুদেৎ-এর। অর্থাৎ তিনিই এটার লেখক।

লেখার বিষয় হল হিরে প্রস্তুত করার উপায়।

ছত্রিশ রকম উপাদান লাগে হিরে তৈরি করতে, এবং তার সব কটিই এই আধুনিক কায়রো শহরেই পাওয়া যায়।

আমরা তিনজনে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম।

সিদ্দিকি বললেন, 'তার মানে ব্যানিস্টার নির্দোষ?'

আমি বললাম, 'সেকথা এখনও বলা চলে না ; কারণ এটাও তো জাল হতে পারে।'

'তা হলে?'

'তা হলে একটাই রাস্তা আছে।'

'কী?'

'এইসব উপাদান সংগ্রহ করে নির্দেশ অনুযায়ী আপনাদের গবেষণাগারে হিরে তৈরি

www.BDeBooks.Com

করা।'

'আপনি ঠিক বলেছেন।'

গবেষণাগারে উনিশ ঘণ্টা কাজ করে যে হিরেটি তৈরি হল, তার আয়তন প্রথম অবস্থায় কোহিনূরের সমান। পল কাটার সময় হল না যদিও, কিন্তু সব রকম পরীক্ষাতেই এ হিরে সসম্মানে উত্তীর্ণ হল। পুলিশ দেখল সে হিরে, লর্ড ক্যাভেনডিশ দেখলেন, এবং সব শেষে দেখল ব্যানিস্টার। তার আনন্দাশ্রু দেখে আমারও চোখে জল এসে গিয়েছিল।

ব্যানিস্টার মুক্তি পেল, পুলিশ আবার লর্ড এইন্‌সওয়র্থের চাকর ফ্রানসিসের খোঁজ করতে শুরু করল।

এই সবের পর আমি আনুষ্ঠানিকভাবে নেফ্রুদেৎ-এর প্যাপাইরাসটা নিয়ে সেটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নীলনদের জলে ফেলে দিলাম।

এই ফরমুলা আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না, কারণ এটা জানি শুধু আমরা তিনজন, এবং আমরা তিনজনেই জানি যে হিরের দুষ্প্রাপ্যতাই তার মূল্যের ও তার অসামান্য কদরের কারণ। কোনও কোনও ব্যাপারে এই দুষ্প্রাপ্যতা বজায় রাখা ভাল এবং দরকার। হিরে যে তার মধ্যে একটি, তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৯৩

শঙ্কু ও ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন

৭ মে

কাল জার্মানি থেকে আমার ইংরেজবন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে একটা আশ্চর্য খবর রয়েছে। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি।

প্রিয় শঙ্কু,

জার্মানিতে আউগ্‌সবুর্গে এসেছি ক্রোলের সঙ্গে ছুটি কাটাতে। এখানে এসে এক আশ্চর্য খবর শুনলাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কথা তুমি নিশ্চয়ই জান। মেরি শেলি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামে একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, তাই লোকের ধারণা হয়েছিল যে, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বুঝি কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু কিছুকাল আগে জানা গেছে যে, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নামে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সত্যিই একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন যিনি মেরি শেলির ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতোই মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। অবিশ্যি ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন যে একটা সামান্য ভুলের জন্য মানবের জায়গায় দানবের সৃষ্টি করেছিলেন, সে খবরও নিশ্চয়ই তুমি জান। যাই হোক, সেই ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের একজন বংশধর এখান থেকে কাছেই ইনগোলস্টাট নামে একটি শহরে নাকি এখনও বর্তমান। আমরা ভেবেছি, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে যাব। যদি তাঁর কাছে তাঁর পূর্বপুরুষ ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাগজপত্র এখনও কিছু থেকে থাকে, তা হলে অদ্ভুত ব্যাপার হবে। আমাদের দুজনেরই ইচ্ছা যে তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। আউগ্‌সবুর্গে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলন হচ্ছে, সেখান থেকে তোমায় যাতে নেমন্তন্ন করা হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দিতে পারি। তারাই তোমার যাতায়াতের খরচ বহন করবে। কী স্থির কর অবিলম্বে জানিও। আশা করি ভাল আছ।

শুভেচ্ছান্তে

জেরেমি সন্ডার্স

আমি পত্রপাঠ ইচ্ছা প্রকাশ করে উত্তর দিয়ে দিয়েছি। প্রতি বছর আমি একবার করে ইউরোপ গিয়ে থাকি। এ বছর এখনও যাওয়া হয়নি। তা ছাড়া ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের আশ্চর্য গবেষণা আর তার শোচনীয় পরিণামের কথা কে না জানে। তিনি মৃতের দেহে প্রাণসঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির মাথায় ভুল করে একটি খুনির মগজ পুরে দেওয়ার ফলে পুনর্জীবনপ্রাপ্ত প্রাণীটি একটি অসম শক্তিশালী নৃশংস দানবের রূপ নেয়। শেষটায় আগুনে পুড়ে এই দানবের মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিক প্রতিভার সাক্ষাৎ মেলে না বললেই চলে। তাঁর কাগজপত্র দেখতে পেলে সত্যিই কাজের কাজ হবে। কিন্তু এতদিন পরে সে সব কাগজ আছে কি? সন্দেহ হয়।

www.BDeBooks.Com

২১ মে

আউগ্‌সবুর্গ থেকে নেমন্তন্ন এসে গেছে। আমি আগামী শনিবার পঁচিশে মে রওনা হচ্ছি। জানি না কপালে কী আছে। তবে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাগজপত্র না পেলেও, আমার দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু ক্রোল আর সন্ডার্সের সঙ্গে আবার দেখা হবে মনে হলেও ভাল লাগছে।

২৭ মে

কাল আউগ্‌সবুর্গে পৌঁছেছি। আমার দুই বন্ধুই আমি আসাতে যারপরনাই আনন্দিত। কাল এখানে বিজ্ঞানী সম্মেলন আছে। তিন দিন চলবে। তারপর ৩১ তারিখে আমরা ইনগোলস্টাট যাব। ইতিমধ্যে ব্যারন জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ঠিকানা জোগাড় করা হয়েছে। শ্লস্ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অর্থাৎ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কাস্‌ল হল তাঁর বাড়ির নাম। জুলিয়াস নাকি চিত্রশিল্পবিশারদ। তাঁর পেন্টিং-এর সংগ্রহ নাকি দেখবার মতো। তাঁর সঙ্গে আলাপের ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠছে।

২ জুন

কাল ইনগোলস্টাট এসেছি আউগ্‌সবুর্গ থেকে মোটরে করে। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে রওনা হয়ে লাঞ্চের আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। প্রাচীন শহর, ছবির মতো সুন্দর। ড্যানিউব এবং শুটার নদীর সঙ্গমস্থলের পাশেই এর অবস্থান। অনেকগুলো প্রাচীন কেল্লা রয়েছে শহরের মধ্যে। আর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও রয়েছে।

আমরা একটা ছোট হোটেলে তিনটে ঘর নিলাম। লাঞ্চ খেয়ে টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে, ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের নম্বর বার করলাম। ক্রোল তখনই ফোন করল। সৌভাগ্যক্রমে ভদ্রলোককে ফোনে পাওয়াও গেল। তিনিও সবেমাত্র লাঞ্চ সেরে উঠেছেন। ক্রোল তার নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'আমি এবং আমার দুই বন্ধু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই। সম্ভব হবে কি ?'

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৎক্ষণাৎ সম্মত হলেন। বললেন, বিকেল সাড়ে চারটেয় তাঁর বাড়িতে গিয়ে চা খেতে।

আমরা যথাসময়ে ট্যাক্সিতে গিয়ে হাজির হলাম। প্রকাণ্ড ফটকের গায়ে বাড়ির নাম শ্বেতপাথরের ফলকে জার্মান ভাষায় লেখা। তারপর দীর্ঘ নুড়ি ঢালা প্যাঁচানো পথ দিয়ে আমরা আসল কাস্‌লের দরজার সামনে পৌঁছোলাম। কড়া নাড়তে একটি উর্দিপরা প্রবীণ ভৃত্য এসে দরজা খুলে আমাদের অভিবাদন জানিয়ে ভিতরে ঢুকতে বলল। আমরা ঢুকে দেখি একটা প্রকাণ্ড হলে এসেছি। তার একপাশ দিয়ে কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। আমরা মখমলে মোড়া সোফায় বসতে না বসতে একটি সৌম্যদর্শন মাঝবয়সি ভদ্রলোক সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করে বললেন, তিনিই জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। আমরা নিজেদের পরিচয় দিলাম। আমি ভারতীয় দেখে ভদ্রলোকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'আমার কাছে ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক বই এবং ভারতীয় শিল্পের অনেক নিদর্শন রয়েছে। আশা করি সেগুলো তোমাকে দেখানোর সুযোগ হবে।'

এরপর ভদ্রলোক আমাদের ভিতরের বৈঠকখানায় নিয়ে গেলেন। এটা সুসজ্জিত

বিশ্রামঘর, দেয়ালে বিখ্যাত ইউরোপীয় শিল্পীদের আঁকা ছবি টাঙানো, আর তার ফাঁকে ফাঁকে মনে হল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন পরিবারের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি।

আমরা সোফাতে বসলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরেকটি ভৃত্য ট্রলিতে করে চা ও পেস্ট্রি নিয়ে এল।

ক্রোলই প্রথম কথা শুরু করল। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন দেখলাম ইংরিজি ভালই জানেন, তাই ইংরিজিতেই কথা হল। ক্রোল বলল, 'আমরা তিনজনেই বৈজ্ঞানিক। আমি ভূতাত্ত্বিক, সন্ডার্স নৃতত্ত্ববিদ আর শঙ্কু আবিষ্কারক বা ইনভেনটার। আমরা তিনজনেই তোমার পূর্বপুরুষ ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কথা জানি। তাঁর বিষয় পড়েছি এবং তাঁর গবেষণা ও তার ফলাফলের কথা জানি। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে— তাঁর কাগজপত্র, নোটস, ফরমুলা ইত্যাদি কি কিছু অবশিষ্ট আছে?'

জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কিছুক্ষণ নির্বাক থেকে স্মিতহাস্য করে বললেন, 'তাঁর এক টুকরো কাগজও আমি নষ্ট হতে দিইনি। শুধু তাই না— তাঁর ল্যাবরেটরিও অপরিবর্তিত অবস্থায় রয়েছে। তাঁর পুরো ডায়রিটা চামড়ায় বাঁধানো অবস্থায় অতি সযত্নে রক্ষিত আছে। অবিশ্যি বুঝতেই পারছ— দেড়শো বছরের উপর হয়ে গেল। সে ডায়রি খুব সাবধানে দেখতে হয়, না হলে পাতা ছিঁড়ে যাবার ভয় আছে। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ছিলেন আমার প্রপিতামহ। আমার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই বৈজ্ঞানিক ছিলেন, একমাত্র আমিই বিজ্ঞানের দিকে যাইনি।'

www.BDeBooks.Com

সন্ডার্স বলল, 'সে ডায়রি কি দেখা যায় ?'

'তোমরা চা খেয়ে নাও,' বললেন জুলিয়াস, 'তারপর আমি দেখাচ্ছি ডায়রিটা।'

কথাটা শুনে আমার বুকটা কেঁপে উঠল।

চা খেতে খেতে আরও কথা হল। তার মধ্যে একটা প্রসঙ্গ মনটাকে বিষিয়ে দিল। জুলিয়াস বললেন, 'গভীর আক্ষেপের বিষয় যে, জার্মানির অতীতের একটি ঘটনা এই ইনগোলস্টাটে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তোমরা হান্‌স রেডেলের নাম শুনেছ ?'

ক্রোল বলল, 'শুনেছি, কিন্তু রেডেল কি এখানে থাকে ?'

'হ্যাঁ, এখানেই থাকে', বললেন জুলিয়াস।

'সে তো হিটলারপন্থী বলে শুনেছি। হিটলারের চিন্তাধারা আবার জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করতে চেষ্টা করছে। একটি দলও গড়েছে বলে শুনেছি।'

'সবই ঠিক,' বললেন জুলিয়াস। 'সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় যে, সে আবার ইহুদি বিদ্বেষের বীজ বপন করার চেষ্টা করছে।'

হিটলার ও তার নেতাদের চক্রান্তে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে পুরে ফেলা হয়েছিল ত্রিশ ও চল্লিশ দশকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষদিকে হিটলারের পতন ও ইহুদি নির্যাতনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

'তুমি তো ইহুদি ?' সন্ডার্স বলল। নামের সঙ্গে 'স্টাইন' থাকলেই ইহুদি বোঝায়, সেটা আমিও জানতাম।

'তা তো বটেই', বললেন জুলিয়াস। 'রেডেলের দলের লোকেরা নিয়মিত মারণাস্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসে আমাকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাদের পার্টির জন্য টাকা নিয়ে যায় আমার কাছ থেকে। অবিশ্যি আমিই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নই, ইনগোলস্টাটের অনেক অবস্থাপন্ন ইহুদিরই এই অবস্থা। রেডেলের মতো হীন ব্যক্তি আর দুটি হয় না। সেই হল এই দলের পাণ্ডা। দলের বাকি লোকগুলো সব গুণ্ডা প্রকৃতির, কিন্তু রেডেল শিক্ষিত, এবং বুদ্ধি রাখে। ইহুদিবিদ্বেষ তার রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে।'

কথাটা শুনে আমাদের খুব খারাপ লাগল। জার্মানিতে আবার দুর্দিন আসবে ভাবতেও ভয় করে।

আমাদের চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। জুলিয়াস বললেন, 'চলো, তোমাদের ডায়রিটা দেখাই।'

এবার আমরা এলাম লাইব্রেরিতে। চতুর্দিকে আলমারি বোঝাই নানান পুরনো বইয়ের মধ্যে নতুন বড় বড় আর্টের বইগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জুলিয়াস একটা দেরাজ থেকে চাবি বার করে একটা সিন্দুক খুললেন। তারপর তার ভিতর থেকে অতি সন্তর্পণে সিল্কে মোড়া একটি মোটা বই বার করলেন।

সিল্কের আবরণটা খুলতে দেখা গেল, চামড়ায় বাঁধানো মলাটে সোনার জলে নকশা করা একটা বই। বই মানে ডায়রি।

'এই হল আমার প্রপিতামহের নোটস। মরা মানুষ বাঁচাবার উপায় এতেই বর্ণনা করা আছে, এবং তাঁর প্রথম এক্সপেরিমেন্ট ও তার শোচনীয় পরিণামের কথাও এতেই আছে।'

পাতাগুলো ঈষৎ বিবর্ণ হয়ে গেলেও কালো কালিতে অতি সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা নোটস এখনও পরিষ্কার পড়া যায়।

'এই ফরমুলা কি আপনার বাবা বা ঠাকুরদাদা আর কখনও ব্যবহার করেছিলেন ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'না,' বললেন, জুলিয়াস, 'সেই দুর্ঘটনার পর এই বইয়ে আর কেউ হাত দেয়নি।'

www.BDeBooks.Com

'আশ্চর্য !'

আমরা তিনজনেই মুগ্ধ, বিস্মিত। আমার মনের ভাব অদ্ভুত। এতকাল আগে একজন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা এই কীর্তি সম্ভব হয়েছিল। ভাবতেও অবাক লাগে।

'এই খাতার কথা ক'জন জানে ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'খাতার কথা আর কেউ জানে না,' বললেন জুলিয়াস, 'তবে আমার প্রপিতামহের গবেষণা আর তার ফলাফলের কথা তো বিশ্ববিদিত।'

আমাদের শুধু আরেকটা কাজ বাকি ছিল, সেটা হল ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ল্যাবরেটরিটা দেখা।

ভদ্রলোক একটা লম্বা ঘোরালো প্যাসেজ দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে তাতে ঢোকালেন।

তাজ্জব ব্যাপার। বিশাল গবেষণাগারে দেড়শো বছরের পুরনো যন্ত্রপাতি সবই রয়েছে। কতরকম যন্ত্রই না বানিয়েছিলেন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সেই আদ্যিকালে।

আমরা আর জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের সময় নষ্ট করলাম না। বড় ইচ্ছা করছিল ডায়রিটাকে পড়ে ফেলতে, কিন্তু তার কোনও উপায় নেই। আমরা তিনজনে জুলিয়াসকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

১২ জুন

আমি কাল আউগ্‌সবুর্গ থেকে দেশে ফিরেছি। ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ডায়রির কথাটা এখন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তবে একটা কথা ভুলতে পারছি না, আর সেটা মোটেই স্বপ্ন নয়, সেটা নির্মম বাস্তব। সেটা হল হিটলারপন্থী হান্‌স রেডেলের কথা। আশা করি, রেডেলকে শায়েস্তা করার একটা উপায় বার করা যাবে। না হলে চরম বিপদ। জার্মানির পক্ষেও, এবং সমস্ত সভ্য সমাজের পক্ষেও।

১৭ জুন

আজ সন্ডার্সের আরেকটা চিঠি। অত্যন্ত জরুরি খবর। চিঠিটা এই—

প্রিয় শঙ্কু,

ডাঃ টমাস গিলেটের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। অত বড় ক্যানসারবিশেষজ্ঞ পৃথিবীর আর কেউ ছিল না। ছিল না বলছি এই কারণে যে, আজ সকাল সাতটায় হার্ট অ্যাটাকে গিলেটের মৃত্যু হয়েছে। সে ক্যানসারের একটি অব্যর্থ ওষুধ তৈরি করতে চলেছিল। আমায় গত মাসেই বলেছিল, 'আরেকটা মাস— তারপরে আর ক্যানসারের ভয় থাকবে না।' কিন্তু সেই ওষুধ তৈরি করার আগেই সে চলে গেল। এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আর হতে পারে না। আমি ক্রোলকেও লিখেছি। আমার ইচ্ছা : ইনগোলস্টাট গিয়ে জুলিয়াস ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে বলে তাঁর প্রপিতামহের ডায়রির সাহায্যে গিলেটকে আবার বাঁচিয়ে তোলা। তুমি কী মনে কর পত্রপাঠ জানাও। গিলেটের মৃতদেহ আমি কোল্ড স্টোরেজে রাখতে বলে দিয়েছি। এখানে ডাক্তারিমহলকে আমার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছি। তারা সকলেই রাজি আছে।

ইতি জেরেমি সন্ডার্স

আমি সন্ডার্সকে ইনগোলস্টাট যাচ্ছি বলে জানিয়ে দিয়েছি। পরশুই রওনা। এবারে

নিজের খরচেই যেতে হবে। কিন্তু কাজটা সফল হলে খরচের দিকটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা চলবে।

২০ জুন, ইনগোলস্টাট

জুলিয়াসকে রাজি করিয়েছি। তাঁর প্রপিতামহের নোটস এতকাল পরে আবার কাজে আসবে শুনে তিনি খুশিই হলেন। আমি বললাম, 'কিন্তু তার আগে আমি একবার খাতাটা আদ্যোপান্ত পড়ে দেখতে চাই। প্রক্রিয়াটা আমাকে ভাল করে বুঝতে হবে তো।'

জুলিয়াস খাতাটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তুমি এটাকে অক্ষত অবস্থায় ফেরত দেবে, সেটা আমি জানি।'

আমি একাই এসেছি এখন ইনগোলস্টাট। আজ সন্ডার্স আর ক্রোলকে টেলিফোন করব। তারা কাল এসে পৌঁছোবে। সন্ডার্সকে অবশ্য গিলেটের মৃতদেহ আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

একটা জিনিস আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছিল। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলাতে মৃতদেহের মাথায় অন্যের মগজ পোরার প্রয়োজন হত। এটা একটা গোলমেলে ব্যাপার। গিলেটের মাথায় অন্যের মগজ পুরলে তাকে বাঁচালে আর সে গিলেট থাকবে না। সে কাজ করবে নতুন মগজ অনুযায়ী— যে কারণে ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মানুষ হয়ে গিয়েছিল নৃশংস হত্যাকারী। আমার মনে হয়, ফরমুলার কিছু রদবদল করতে হবে। সেটা সম্ভব কি না সেটা ডায়রিটা পড়ে দেখলে বুঝতে পারব।

২১ জুন

কাল রাত্রেই ডায়রিটা পড়ে ফেলেছি। শুধু তাই নয়— সারা রাত জেগে ফরমুলায় যা পরিবর্তন করার দরকার ছিল, তা করে ফেলেছি। এখন গিলেট বেঁচে উঠলে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে, কারণ তার নিজের মগজই ব্যবহার করা হবে। ফরমুলায় আরও একটা পরিবর্তন করেছি ; ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলায় প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হচ্ছিল। স্বাভাবিক বজ্রপাতের জন্য অপেক্ষা করতে হলে দেরি হয়ে যাবে। তাই কৃত্রিমভাবে মৃতদেহে হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সঞ্চারের উপায় আবিষ্কার করেছি। এখন ফরমুলাটাকে শুধু ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ফরমুলা না বলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন-শঙ্কু ফরমুলা বলা চলে। দেখি এতে কাজ হয় কি না।

২৩ জুন

গিলেটের মৃতদেহ সমেত সন্ডার্স ও চারজন লোক লন্ডন থেকে এসেছে কাল রাত্রে। ক্রোল আজ সকালে এসেছে। আজই আমাদের কাজ হবে। ইতিমধ্যে জুলিয়াস ল্যাবরেটরি থেকে ধুলোর শেষ কণাটুকু পর্যন্ত সরিয়ে দিয়েছেন তাঁর লোক দিয়ে। যন্ত্রপাতিগুলোকে ঝকঝকে নতুন বলে মনে হচ্ছে।

এবার এসে অবধি জুলিয়াসকে একটু মনমরা দেখছি। আজ কারণটা জিজ্ঞেস করাতে বললেন হান্‌স রেডেলের দল জুলিয়াসের এক বিশিষ্ট ইহুদি বন্ধু বোরিস অ্যারনসনকে হত্যা করেছে। অ্যারনসন ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক এবং অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। অ্যারনসনকে

www.BDeBooks.Com

রেডেল নানাভাবে উত্ত্যক্ত করত। তাই আর না পেরে অ্যারনসন খবরের কাগজে রেডেল এবং তার হিটলারপন্থী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করে। এর বদলা হিসাবে রেডেল অ্যারনসনের প্রাণ নেয়। ব্যাপারটা সে এমন কৌশলে করে যে, পুলিশে এ নিয়ে কিছু করতে পারেনি। অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে মৃত্যু— এই বলা হয় রিপোর্টে। অথচ জুলিয়াস এবং ইনগোলস্টাটের সব ইহুদিই জানে এটা কার কীর্তি।

কিন্তু এই দুর্ঘটনা সত্ত্বেও জুলিয়াস আমাদের সব রকমে সাহায্য করে চলেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে, আজই সন্ধ্যায় গিলেটের মৃতদেহের উপর কাজ শুরু হবে। রাসায়নিক মালমশলা যা দরকার, সবই আজকের মধ্যে জোগাড় হয়ে যাচ্ছে। দুষ্প্রাপ্য কোনও জিনিসই নেই। ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ফরমুলার সবচেয়ে বড় গুণই ছিল এর সরলতা। সন্ডার্স ও ক্রোল তো আমাকে সাহায্য করবেই, তা ছাড়া আরও দুজন স্থানীয় সহকর্মীকে কাজে বহাল করা হয়েছে। দশজন লোক অরাজি হবার পর দুজনকে পাওয়া গেল, যারা কাজটা করতে রাজি হল। সকলেই জানে ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের দানবের কথা, এবং তাদের ধারণা আমরা এবারও একটি দানব সৃষ্টি করতে চলেছি।

২৪ জুন

এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল।

কাল সাড়ে সাত ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আজ ভোর পাঁচটায় প্রথম গিলেটের দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। ডান হাতে মৃদু কম্পন, ঠোঁটের কোনায় কম্পন, চোখের পাতায় কম্পন। আমাদের সকলের উৎকণ্ঠায় প্রায় শ্বাসরোধ হবার উপক্রম।

আধ ঘণ্টা পরে গিলেট চোখ খুলল। তারপর সে চোখের মণি এদিক ওদিক ঘোরাল। তারপর ঠোঁট খুলে প্রথম কথা বেরোল, 'হোয়্যার অ্যাম আই ?'

আমি গিলেটের হাত থেকে স্ট্র্যাপ খুলে নিলাম। গিলেট ধীরে ধীরে উঠে বসল। তারপর প্রশ্ন এল, 'আমি কত দিন ঘুমিয়েছি ?'

সন্ডার্স বলল, 'সেভেন ডে'জ, টমাস।'

গিলেট বলল, 'আশ্চর্য ! এদিকে আমার কাজ অসমাপ্ত পড়ে রয়েছে। আর দু দিন পেলেই ওষুধটা তৈরি হয়ে যায়।'

'তুমি কালই আবার কাজ শুরু করতে পারবে,' বলল সন্ডার্স। 'এখন তুমি রয়েছ জার্মানিতে। তোমার ঘুম ভাঙানো হয়েছে এখানকার গবেষণাগারে। এই জায়গার নাম ইনগোলস্টাট।'

আমি বললাম, 'আপাতত তুমি একটু বিশ্রাম করো বিছানায় শুয়ে, তারপর তোমাকে খেতে দেওয়া হবে।'

আমার যে কী আরাম লাগছিল তা বলতে পারি না। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল জুলিয়াস, আমার ডান হাতটা তার দু' হাতে চেপে। আমি বললাম, 'তোমার প্রপিতামহ যে কত এগিয়ে ছিলেন বৈজ্ঞানিক হিসাবে, তা আজকে বুঝতে পারছি।'

২৬ জুন

আজ ভয়াবহ অভিজ্ঞতা।

গিলেটকে কালই বিলেত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায়। তার সঙ্গে যে

চারজন লোক সন্ডার্সের সঙ্গে এসেছিল, তারাও ফিরে গেছে। আমাদের তিন জনকে জুলিয়াস আরও তিন-চার দিন থেকে যেতে বললেন। 'আমার আর্টের সংগ্রহ তোমাদের দেখানো হয়নি', বললেন জুলিয়াস। 'তোমরা হোটেল থেকে আমার বাড়িতে চলে এসো। এখানে ঘরের অভাব নেই।'

আমরা তাই করলাম। কাল জুলিয়াস তাঁর ভারতীর ছবি ও ভাস্কর্যের সংগ্রহ আমাদের দেখালেন। আশ্চর্য সব মোগল ও রাজপুত ছবি সংগ্রহ করেছেন জুলিয়াস। বললেন, 'এগুলো আমার গত বাইশ বছরের সংগ্রহ।'

অতিথিসেবক হিসেবে জুলিয়াসের তুলনা নেই। আমরা সবরকম সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছি, চমৎকার খাচ্ছি, কাস্‌লের তিন দিকে ঘেরা ফুলের বাগানে বেড়াচ্ছি।

ঘটনাটা ঘটল আজ সকাল সাড়ে দশটার সময়। আমরা চারজন জুলিয়াসের বৈঠকখানায় বসে গল্প করছি, এমন সময় জুলিয়াসের চাকর ফ্রিৎস ফ্যাকাশে মুখ করে মাথার উপর দুটো হাত তুলে আমাদের ঘরে ঢুকল। তার পিছন পিছন ঢুকল চারজন গুণ্ডা জাতীয় লোক, তাদের প্রত্যেকের হাতেই একটা করে মোক্ষম মারণাস্ত্র।

'হাত তোলো!' হুংকার দিয়ে আদেশ করলেন বোধ হয় দলের যিনি নেতা— তিনি। আমরা তিন জনেই অগত্যা হাত তুললাম।

'শোনো', বললেন নেতা, 'আমরা শুনেছি লন্ডনের একজন মৃত ডাক্তারকে এখানে পুনর্জীবন দান করা হয়েছে। ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কীর্তিকলাপের কথা আমরা জানি, কিন্তু তার যন্ত্রপাতি যে এখনও ব্যবহারযোগ্য রয়েছে, এবং এখনও যে ইচ্ছে করলে সেই কাস্‌লের গবেষণাগারে মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যায়, তা আমাদের ধারণা ছিল না। সেটা আমরা সবে জানতে পেরেছি। আমরা যে কারণে আজ এসেছি, সেটা এবার বলি। আমাদের দলের নেতা হান্‌স রেডেল আজ ভোর সাড়ে পাঁচটায় থ্রম্বোসিসে মারা গেছেন। আমরা চাই তাঁকে আবার বাঁচিয়ে তোলা হোক। এটা আমাদের আদেশ। এটা না মানলে তোমাদের

www.BDeBooks.Com

একজনকেও আর বাঁচতে দেওয়া হবে না। ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের যন্ত্রও আর তোমাদের উদ্ধার করতে পারবে না, কারণ তোমাদের মৃতদেহের গলায় পাথর বেঁধে ড্যানিউবে ডোবানো হবে। এ বিষয়ে তোমাদের কী বলার আছে, বলো।'

'আমাদের ক্ষতি করলে তোমরাও পুলিশের হাত থেকে নিস্তার পাবে না এটা জেনে রেখো,' রুক্ষ স্বরে বলে উঠলেন জুলিয়াস।

সাপের মতো ফোঁসফোসিয়ে উঠল সামনের গুণ্ডাটি, 'আর একটা কথা বলেছ কি গুলি চালাব আমরা। এখন বলো, হের রেডেলের মৃতদেহ কখন এনে দেব এখানে। জেনে রাখো— আমাদের এ অনুরোধ না রাখলে তোমাদের একজনকেও আর দেশে ফিরতে হবে না, ব্যারন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকেও আর রক্ষা পেতে হবে না।'

কী আর করি। আমাদের হাত পা বাঁধা। আমি বললাম, 'রেডেলের মৃতদেহ আজ বিকেলে এখানে নিয়ে এসো। তার আগে আমাদের তৈরি হতে হবে। তবে পরশু সকালের আগে রেডেল বেঁচে উঠবে না, কারণ প্রক্রিয়াটা জটিল।'

গুণ্ডার দল আরেকবার আমাদের শাসিয়ে চলে গেল। জুলিয়াস বললেন, 'গিলেটের খবরটা সাংবাদিকদের দেওয়া যে কী ভুল হয়েছে। খবরটা প্রচার না হলে এরা জানতে পারত না। আর রেডেলের মৃত্যুতে হিটলারপন্থীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। ইনগোলস্টাটে ইহুদি বিদ্বেষের শেষ হত।'

২৬ জুন, রাত বারোটা

ঘুম আসছে না। এমনভাবে এই নৃশংস দলের কাছে আমাদের পরাজয় স্বীকার করতে হবে এটা ভাবতেও মনমেজাজ বিষিয়ে যাচ্ছে। অথচ কী করা যায় ? একটা উপায় আমি ভেবে বার করেছি, কিন্তু তাতে কী ফল হবে সেটা আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এ ছাড়া বোধ হয় রাস্তা নেই। এতে জুলিয়াসের সাহায্য দরকার হবে। যদি এটা সফল হয় তা হলে সব দিক দিয়েই মঙ্গল হবে, এবং আমারও কপালে জয়তিলক আঁকা হবে। এর আগে নানান সংকটপূর্ণ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি ; এবার হবে চরম পরীক্ষা।

২৮ জুন

আগে রেডেলের পুনর্জীবনপ্রাপ্তির ঘটনাটা বলি।

আমাদের নির্দেশমতো রেডেলের দলের পাঁচজন লোক তার মৃতদেহ গত পরশু বিকেলে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন কাস্‌লে নিয়ে আসে। লোকটার চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে, সে এত নিষ্ঠুর। মোটামুটি সাধারণ চেহারা, বয়স চল্লিশের বেশি না। আমি রেডেলের লোকদের বললাম, মৃতদেহটা ল্যাবরেটরিতে ইস্পাতের খাটের উপর শুইয়ে দিতে। তারপর বললাম, 'খাটে শুইয়ে দিয়ে তোমরা এখন চলে যাও, পরশু ভোরে এসো। রেডেল যে বেঁচে যাবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু তোমরা যদি রিভলভার নিয়ে আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা ঘিরে থাক, তা হলে আমাদের পক্ষে কাজ করা সম্ভব হবে না। আমাদের উপর তোমাদের কিছুটা বিশ্বাস রাখতে হবে। পরশু সকালে এসে যদি দেখ রেডেল তখনও মৃত, তা হলে তোমাদের যা করবার কোরো। একটা মৃতদেহ যখন বেঁচে উঠেছে, তখন এটাও না বাঁচার কোনও কারণ নেই।'

সৌভাগ্যক্রমে রেডেলের দলের লোকেরা আমাদের কথার উপর ভরসা করে চলে গেল।

এখানে বলে রাখি যে, আমার মারাত্মক অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা আমি সঙ্গে আনিনি, কারণ আমার কোনও ধারণা ছিল না যে আমাদের এমন বিপদে পড়তে হতে পারে। অ্যানাইহিলিন থাকলে রেডেলের পুরো দলকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া ছিল এক মুহূর্তের কাজ।

রেডেলের লোকেরা চলে গেলে পর আমি জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনকে একটা প্রশ্ন করলাম।

'এখানে মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করতে পারে এমন সার্জন আছে? খুব ভাল লোক হওয়া চাই।'

জুলিয়াস বললেন, 'আছে বই কী। হাইনরিখ কুমেল জার্মানির একজন বিখ্যাত ব্রেন সার্জন। তাঁর সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে।'

এবার আমি বললাম, কেন আমি এই প্রশ্নটা করছি।

'রেডেলের মৃতদেহকে আমি ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন যে পদ্ধতিতে মরা মানুষ বাঁচিয়ে ছিলেন, সেই পদ্ধতিতে বাঁচাতে চাই। অর্থাৎ, এতে আমার একটি মস্তিষ্কের প্রয়োজন হবে, যা রেডেলের মস্তিষ্কের জায়গায় তার মাথায় পুরতে হবে। এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় আলোচনা আছে।'

আমি ক্রোল আর সন্ডার্সকে ব্যাপারটা জানতে দিতে চাচ্ছিলাম না, তাই জুলিয়াসকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে আমার পরিকল্পনাটা বললাম। জুলিয়াস বলল আমাকে সবরকমে সাহায্য করবে। জুলিয়াসের উপর নির্ভর করতে হচ্ছিল, কারণ আমরা তো এখানে বিশেষ কাউকেই চিনি না। আর প্রাচীন পরিবারের বংশধর হিসেবে জুলিয়াসের এখানে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে।

আমাদের আর রাত্রে ডিনার খাওয়া হল না। সন্ডার্স আর ক্রোল দুজনেই ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত। বলছে, 'তুমি কী উপায় স্থির করেছ, সেটা আমাদের বলছ না কেন?'

আমি বললাম, 'আমি নিজেই জানি না আমার পরীক্ষার ফলাফল কী হবে। কিছুটা অন্ধকারে ঢিল ছুড়ছি। তবে যা হবার সে তো তোমরা পরশু সকালেই দেখতে পাবে।'

পরদিন দশটার সময় ডাঃ কুমেল এলেন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে, একটা কাচের বয়ামে স্পিরিটে চোবানো একটা মস্তিষ্ক নিয়ে। সাড়ে এগারোটার মধ্যে রেডেলের মস্তিষ্ক বার করে নিয়ে তার জায়গায় নতুন মস্তিষ্কটা ঢোকানো হল। এত নিপুণ ও দ্রুত অস্ত্রোপচার আমি কমই দেখেছি। কুমেল শুধু বললেন যে, তাঁর কাজের বিনিময়ে তিনি আমাদের পুরো এক্সপেরিমেন্টটা দেখতে চান, পয়সায় তাঁর দরকার নেই। আমরা অবশ্য এককথায় রাজি হয়ে গেলাম।

বারোটার সময় ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের গবেষণাগারে আমাদের কাজ শুরু হল। আমি মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছি। যদি মানবের জায়গায় দানবের সৃষ্টি হয়, তা হলে যে কী হবে জানি না।

সারারাত কাজ করার পর সকাল সাতটায় রেডেলের দেহে প্রাণের লক্ষণ দেখা গেল। গিলেটের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, এর বেলায়ও সেই একই ব্যাপার। এবং প্রথম যে প্রশ্ন করল রেডেল জার্মান ভাষায়—তাও ঠিক গিলেটেরই প্রশ্ন, 'আমি কোথায় রয়েছি?'

আমি এগিয়ে গিয়ে জার্মান ভাষায় বললাম, 'তুমি চারদিন ঘুমিয়েছিলে। আজ তোমার ঘুম ভেঙেছে। তুমি রয়েছ ব্যারন জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ল্যাবরেটরিতে।'

'জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন?'

'হ্যাঁ।'

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এবার হঠাৎ দেখলাম ঘরে আরও লোক রয়েছে। আমাদের

www.BDeBooks.Com

পিছনেই হাতে রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রেডেলের দলের দুজন গুণ্ডা। রেডেলকে জীবিত দেখে তাদের দৃষ্টি বিস্ফারিত।

এবার রেডেলের চোখ গেল এই গুণ্ডাদের দিকে। সে বলল, 'এ কী, এরা কী করছে এখানে ?'

এর ফল হল অদ্ভুত। গুণ্ডাদের একজন বোকার মতো মুখ করে বলল, 'আমি এমিল, হের রেডেল— তোমার দলের লোক !'

অন্য লোকটিও তার দেখাদেখি বলল, 'আমি পিটার, হের রেডেল— তোমার অনুচর !'

পুনর্জীবনপ্রাপ্ত রেডেল গর্জিয়ে উঠল, 'দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে ! তোমরা সব শয়তানের দল। তোমাদের জন্যই জার্মানি আবার জাহান্নমে যেতে চলেছে। এক্ষুনি চলে যাও আমার সামনে থেকে !'

পিটার ও এমিল নামক দুই গুণ্ডা হতভম্বের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার সন্ডার্স ও ক্রোল আমাকে এসে চেপে ধরল, 'কী ব্যাপার, আমাদের খুলে বলো।'

আমি বললাম, 'আগে রেডেলের বিশ্রামের একটা ব্যবস্থা করে নিই।'

আমি রেডেলকে কমলালেবুর রস খাইয়ে আবার শুইয়ে দিলাম। তারপর ক্রোল আর সন্ডার্সের দিকে ফিরে বললাম, 'জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সাহায্য না করলে আমার এই এক্সপেরিমেন্ট সম্ভব হত না।'

'কিন্তু কার মগজ পোরা হয়েছিল রেডেলের মাথায় ?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

আমি বললাম, 'বোরিস অ্যারনসন, যাঁকে রেডেলের দল হত্যা করেছিল। জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন অ্যারনসনের ছেলের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পুলিশকে জানিয়ে অ্যারনসনের কবর খুঁড়ে তাঁর মৃতদেহ বার করে ডাঃ কুমেলকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করিয়ে তাঁর মগজ বার করেন। সেই মগজই রেডেলকে নতুন মানুষে পরিণত করেছে। সে আর আগের রেডেল নেই। যতদূর মনে হয়, হিটলারপন্থী দল এবার নিশ্চিহ্ন হবে।'

জুলিয়াসের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর চোখে জল। তিনি আবার এসে আমার হাত দুটো চেপে ধরে বললেন, 'জার্মানি তোমার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।'

আমি বললাম, 'সবই তোমার পূর্বপুরুষের কীর্তি। এর জন্যে যদি কারও ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়ে থাকে, তা হলে তিনি হলেন ব্যারন ভিক্টর ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন।'

১৩ জুলাই

দেশে ফিরে এসে কালই জুলিয়াস ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম। তিনি জানিয়েছেন, রেডেল এখন নিজেকে ইহুদি বলে পরিচয় দেয়। তার দল ভেঙে গেছে, ইনগোলস্টাটের ইহুদিরা এখন নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বাস করছে।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৫

www.BDeBooks.Com

ডাঃ দানিয়েলির আবিষ্কার

১৫ এপ্রিল, রোম

কাল এক আশ্চর্য ঘটনা। এখানে আমি এসেছি একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে। কাল স্থানীয় বায়োকেমিস্ট ডাঃ দানিয়েলির বক্তৃতা ছিল। তিনি তাঁর ভাষণে সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছেন। অবিশ্যি আমি যে অন্যদের মতো অতটা অবাক হয়েছি তা নয়, কিন্তু তার কারণটা পরে বলছি।

দানিয়েলির আশ্চর্য ভাষণের কথা বলার আগে একটা কথা বলা দরকার। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসনের উপন্যাস 'ডাঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড'-এর কথা অনেকেই জানে। যারা জানে না তাদের জন্য বলছি যে, ডাঃ জেকিল বিশ্বাস করতেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটা ভাল আর একটা মন্দ দিক থাকে। এই মন্দ প্রবৃত্তিগুলো মানুষ দমন করে রাখে, কারণ তাকে সমাজে বাস করতে হলে সমাজের কতকগুলো নিয়ম মানতে হয়। কিন্তু ডাঃ জেকিল দাবি করেছিলেন তিনি এমন ওষুধ বার করতে পারেন, যে ওষুধ কেউ খেলে তার ভিতরের হীন প্রবৃত্তিগুলো বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে একটা নৃশংস জীবে পরিণত করবে। ডাঃ জেকিলের এ কথা কেউ বিশ্বাস করেনি, তাই তিনি তাঁর গবেষণাগারে ঠিক এইরকমই একটা ওষুধ তৈরি করে নিজের উপর প্রয়োগ করে এক ভয়ংকর মানুষ মিঃ হাইডে পরিণত হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় তিনি খুনও করেছিলেন, যদিও ডাঃ জেকিল এমনিতে ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি।

স্টিভেনসনের এই উপন্যাস যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এমন ওষুধ বাস্তবে আজ পর্যন্ত কেউ তৈরি করতে পারেনি। দানিয়েলি দাবি করছেন তিনি করতে চলেছেন, এবং দানিয়েলির আগেই গিরিডিতে আমার ল্যাবরেটরিতে আমি করেছি। আমার ওষুধ আমি নিজে খাইনি, কিন্তু আমার পোষা বেড়াল নিউটনকে এক ফোঁটা খাইয়েছিলাম। খাওয়ানোর তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে অত্যন্ত হিংস্রভাবে আক্রমণ করে আমার ডান হাতে আঁচড় দিয়ে আমাকে জখম করে। আমি আমার ওষুধের নাম দিয়েছিলাম 'এক্স'। একই সঙ্গে 'অ্যান্টি-এক্স' নামে আরেকটা ওষুধ বার করি যেটা 'এক্স'-এর অ্যান্টিডোট ; অর্থাৎ যেটা খেলে মানুষ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। নিউটনকে 'অ্যান্টি-এক্স' খাইয়ে শান্ত করতে হয়েছিল।

দানিয়েলির বক্তৃতার সময় তাঁর অবস্থা জেকিলের মতোই হয়েছিল। অন্তত তিনজন বৈজ্ঞানিক—ইংলন্ডের ডাঃ স্টেবিং, জার্মানির প্রোফেসর ক্রুগার ও স্পেনের ডাঃ গোমেজ—দানিয়েলির কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ফলে মিটিং-এ একটা তুমুল বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দানিয়েলির পক্ষে তাঁর মেজাজ ঠিক রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এমনিতে দানিয়েলির সঙ্গে আমার এখানে এসেই আলাপ হয়েছে। অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র স্বভাবের লোক বলে মনে হয়েছিল। অনেক দিন পরে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে আজকের মতো একটা গোলযোগ হতে দেখলাম। আমি অবিশ্যি আমার নিজের ওষুধের কথা দানিয়েলি বা অন্য

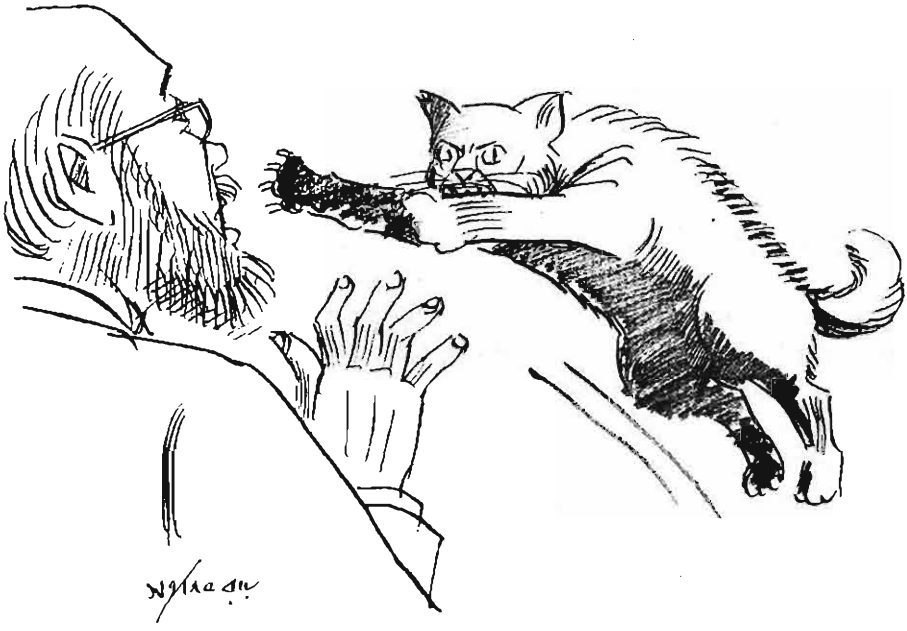

কাউকে বলিনি। দানিয়েলি বললেন, তাঁর ওষুধ দু-একদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে। তারপর সেটা তিনি নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখবেন, যেমন স্টিভেনসনের গল্পে ডঃ জেকিল করেছিলেন। ব্যাপারটা আমার ভাল লাগল না, কারণ এক্সপেরিমেন্ট যদি সফল হয়, তা হলে ওষুধখাওয়া দানিয়েলি কীরকম ব্যবহার করবে তা বলা কঠিন। নিউটনের যা হিংস্র ভাব দেখেছি তাতে আমার রীতিমতো ভয় ঢুকে গেছে।

আজ আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডেলিগেটদের লাঞ্চ আছে। আমরা আছি হোটেল সুপার্বাতে। এইখানেই একতলায় ডাইনিংরুমে লাঞ্চ। সম্মেলন চলবে আর দু দিন। তারপর আরও দিন দু-তিন রোমে থেকে দেশে ফিরব।

১৭ এপ্রিল

আজ সম্মেলনের পর দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম, তাঁর বক্তৃতায় তিনি যা বলেছেন তা আমি বিশ্বাস করি। আমারও একই মত। তাতে ভদ্রলোক যারপরনাই খুশি হলেন।

আমি বললাম, 'তুমি যে ওষুধ বানাচ্ছ, সেইসঙ্গে তার প্রভাব দূর করার জন্যও ওষুধ তৈরি করছ আশা করি।'

'তা তো বটেই,' বললেন দানিয়েলি। 'এ ব্যাপারে আমি স্টিভেনসনের উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছি। এতদিন কেন যে কেউ এরকম একটা ওষুধ তৈরি করতে চেষ্টা করেনি, তা জানি না।'

আমি বললাম, 'তার কারণ স্টিভেনসনের গল্পেই পাওয়া যাবে। যদি সেই ওষুধ মিঃ হাইডের মতো এমন মানুষ তৈরি করতে পারে, তা হলে সে ওষুধ খাওয়ার কী বিপদ সে তো

www.BDeBooks.Com

বুঝতেই পারছ।'

'কিন্তু তা বলে তো বিজ্ঞানকে থেমে থাকতে দেওয়া যায় না,' বলল দানিয়েলি। 'পরীক্ষানিরীক্ষা চালাতেই হবে। এবং আমার পরীক্ষা যদি সফল হয় তা হলে তার পরিণাম যাই হোক না কেন, এটা মানতেই হবে যে সেটা হবে বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটা নিদর্শন।'

'তবে তুমি যদি একটা হাইডে পরিণত হও, তা হলে ব্যক্তিগতভাবে আমার সেটা মোটেই ভাল লাগবে না।'

'দেখা যাক কী হয়।'

'তুমি কী কী উপাদান দিয়ে ওষুধটা তৈরি করেছ, সেটা জানতে পারি কি ?'

ভদ্রলোক যা উত্তর দিলেন তা শুনে আমি একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করলাম।

আমিও ঠিক একই উপাদান দিয়ে আমার ওষুধটা তৈরি করেছি।

সেটা অবিশ্যি আর দানিয়েলিকে বললাম না, এবং দানিয়েলিও তাঁর উপাদানের পরিমাণ আমাকে বললেন না।

১৮ এপ্রিল

আজ কাগজে সাংঘাতিক খবর।

ডাঃ স্টেবিংকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমাদের হোটেলটা টাইবার নদীর উপর। স্টেবিং নাকি রোজ ডিনারের আগে টাইবারের ধারে হাঁটতে যেতেন। আজও গিয়েছিলেন, কিন্তু আর ফেরেননি। পুলিশ সন্দেহ করছে তিনি কোনও গুণ্ডার দ্বারা নিহত হয়েছেন, এবং গুণ্ডারা তাঁর মৃতদেহ টাইবারের জলে ফেলে দিয়েছে।

আমার কিন্তু ধারণা অন্যরকম। স্টেবিং দানিয়েলির বক্তৃতার পর তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং দানিয়েলিকে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দেন। দানিয়েলিও বলেছিলেন, তাঁর ওষুধ দু দিনের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে।

আমি টেলিফোন ডিরেক্টরি খুলে দেখলাম যে দানিয়েলির বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে ২৭ নং ভিয়া সাক্রামেন্টো। আমি আর দেরি না করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা তার বাড়িতে চলে গেলাম।

বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধা হল না, কিন্তু গিয়ে শুনি দানিয়েলি বাড়ি নেই। দানিয়েলির চাকর দরজা খুলেছিল ; আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'সিনিয়র আলবের্তির সঙ্গে কথা বলবেন ?'

'তিনি কে ?'

'তিনি প্রোফেসর দানিয়েলির সহকর্মী।'

আমি বললাম, 'বেশ, তাঁকেই ডাকো।'

চাকর চলে গেল। দু মিনিটের মধ্যেই একটি বছর ত্রিশের যুবক বৈঠকখানায় এসে ঢুকল। কালো চুল, কালো চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

'তুমি কি দানিয়েলির সহকর্মী ?'

'সহকর্মীর চেয়ে সহকারী বললেই ঠিক হবে। আমি মাত্র তিন বছর দানিয়েলির সঙ্গে আছি। আপনি কি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কু ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

যুবকের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, 'আমি আপনার বিষয়ে অনেক শুনেছি।

আপনার আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক পড়েছি। আপনার দেখা পেয়ে অত্যন্ত গর্ব বোধ করছি।'

আমি বললাম, 'সে কথা শুনে আমারও খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমি ডাঃ দানিয়েলির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। তিনি কখন আসবেন ?'

'যে কোনও মুহূর্তে,' বলল আলবের্তি। 'তিনি বাজারে গেছেন কিছু কেনাকাটা করতে। আপনি একটু বসে যান।'

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলাম। সময় কাটানোর জন্য আলবের্তিকে প্রশ্ন করলাম, 'প্রোফেসরের ওষুধ কি তৈরি হয়ে গেছে ?'

'হ্যাঁ, সে তো পরশুই হয়ে গেছে।' বলল আলবের্তি, 'তারপর থেকেই প্রোফেসর কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন। সামান্য একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি তাঁর মধ্যে। সেটা যে কী সেটা স্পষ্টভাবে বলতে পারব না।'

'তিনি কি ওষুধটা খেয়েছেন ?'

'তা তো বলতে পারছি না। ওষুধটা উনি সম্পূর্ণ নিজে তৈরি করেছেন। আমি ওঁকে কোনওরকমভাবে সাহায্য করিনি। ওষুধের ফরমুলাও আমি জানি না। তবে ওষুধটা যে হয়ে গেছে সেটা উনি আমাকে বলেছেন। অবিশ্যি না বললেও আমি বুঝতাম, কারণ গত এক মাস উনি সারাদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছেন দরজা বন্ধ করে। দু দিন থেকে ওঁকে আর কাজ করতে দেখছি না।'

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। চাকর এসে দরজা খুলে দিতে দানিয়েলি হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে ঢুকলেন।

'গুড মর্নিং প্রোফেসর শঙ্কু। দিস ইজ এ ভেরি প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ !'

আমিও ভদ্রলোককে প্রত্যাভিবাদন জানালাম। বললাম, 'খবর না দিয়ে এসে পড়েছি বলে আশা করি কিছু মনে করছ না।'

'মোটেই না, মোটেই না। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। তারপর কী খবর বলো।'

'খবর তো তোমার—তোমার ওষুধের খবর। ওটা তৈরি হল ?'

'হয়েছে বই কী। পরশুই রাত্রে হয়েছে তৈরি।'

'পরীক্ষা করে দেখেছ ?'

'আমি চায়ের চামচের এক চামচ খেয়ে দেখেছি।'

'তারপর ?'

'তারপর কী হল জানি না।'

'তার মানে ?'

'মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। সকালে উঠে দেখি আমার বিছানায় শুয়ে আছি। শরীরে কোনও গ্লানি নেই। রাত্রে কী ঘটেছে কিচ্ছু জানি না।'

'আজ কাগজে স্টেবিং-এর মৃত্যুসংবাদ পড়েছ ?'

'পড়েছি বই কী—আর পড়ে অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছি। যদিও সে আমার বক্তৃতার প্রতিবাদ করেছিল, কিন্তু সে অত্যন্ত উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী ছিল।'

'স্টেবিং-এর মৃত্যু সম্বন্ধে তুমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছেছ ?'

'এ তো বোঝাই যাচ্ছে স্থানীয় গুণ্ডাদের কীর্তি। তাকে মেরে শুনলাম টাইবারের জলে লাশ ফেলে দিয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই অবিশ্যি সে লাশ আবার ভেসে উঠবে।'

আমি আর দানিয়েলির সময় নষ্ট করলাম না। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। দানিয়েলির ওষুধ খাওয়ার কথাটা এখনও মাথায় ঘুরছে। সে যে কিছুই টের পেল না, এটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার। আমার ওষুধেও কি এই একই প্রতিক্রিয়া

www.BDeBooks.Com

হবে ? নিউটন যে আমাকে আক্রমণ করে, সেটা কি সে অজান্তে করে ?

১৯ এপ্রিল

কাল রাত্রে সাড়ে এগারোটার সময় জার্মানির প্রোফেসর ক্রুগার আর স্পেনের ডাঃ গোমেজ খুন হয়েছেন তাঁদের ঘরে। সেইসঙ্গে টাইবার নদীতে স্টেবিং-এর লাশও পাওয়া গেছে। লাশের গলায় আঙুলের গভীর দাগ। অর্থাৎ তাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল।

এবার আর আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। তিনটে খুনই দানিয়েলির কীর্তি। পুলিশ অবশ্য তদন্ত করছে। ক্রুগার বা গোমেজের কোনও টাকাপয়সা চুরি যায়নি। কাজেই এটা চোরডাকাতের কীর্তি নয়।

পুলিশ আমাদের হোটেলের রিসেপশনিস্টকে জেরা করে জানতে পারে যে, কাল রাত্রে এগারোটার সময় একটি কুৎসিত লোক নাকি হোটেলে এসে ক্রুগার আর গোমেজের ঘরের

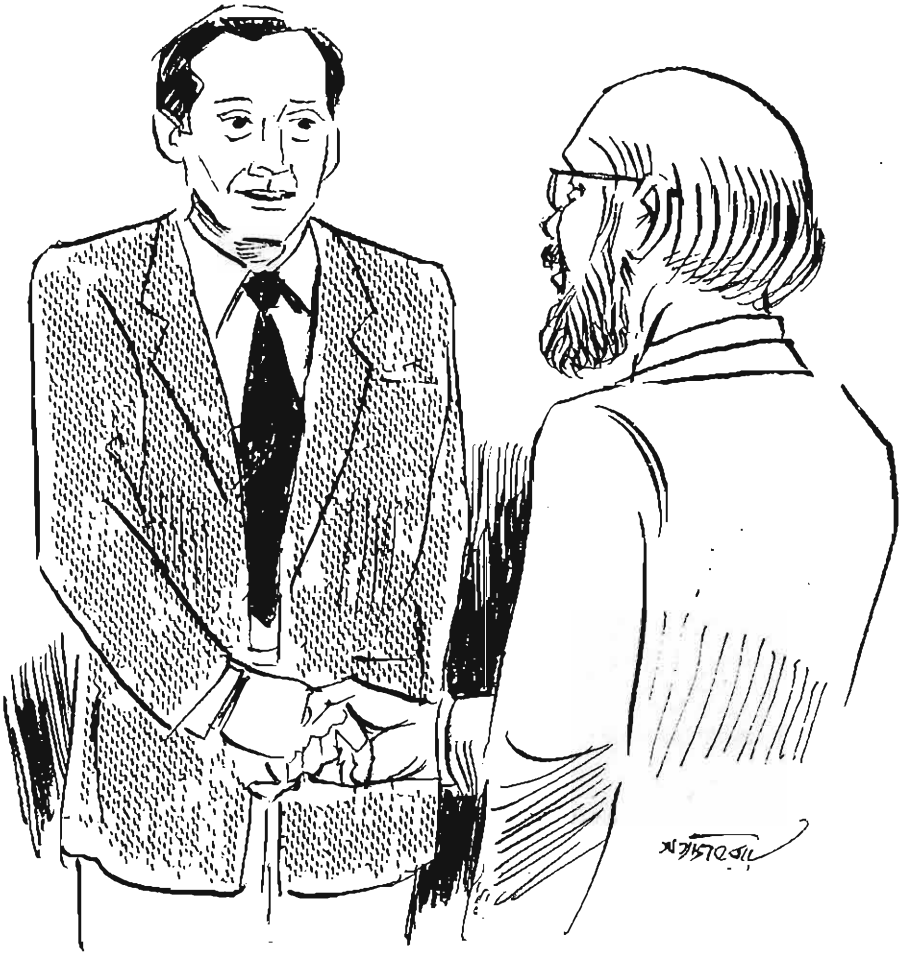

নম্বর জানতে চায়। তারপর সে দুজনকেই টেলিফোন করে।

'কী কথা বলেছিল সেটা শুনেছিলে ?' পুলিশ জিজ্ঞেস করে।

'আজ্ঞে না, তা শুনিনি।'

ক্রুগার আর গোমেজ দুজনকেই স্টেবিং-এর মতোই গলা টিপে মারা হয়েছে। আততায়ী যে অত্যন্ত শক্তিশালী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ দানিয়েলিকে দেখলে তার মধ্যে শারীরিক শক্তির কোনও লক্ষণ পাওয়া যায় না। ওর বয়সও হয়েছে অন্তত ষাট।

আমি এবার দানিয়েলির বাড়িতে একটা ফোন করলাম। সে নিজেই ফোন ধরল। শান্ত কণ্ঠস্বর। কোনও উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। আমি ফোন করছি শুনে অত্যন্ত হৃদ্যতার সঙ্গে আমাকে অভিবাদন জানাল। আমি বললাম, 'আমি একবার তোমার বাড়িতে আসতে চাই।'

'এক্ষুনি চলে এসো', বলল দানিয়েলি। 'আমি সারা সকাল বাড়িতে আছি।'

দশ মিনিটে দানিয়েলির বাড়িতে হাজির হলাম। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আমার সঙ্গে করমর্দন করে আমায় সোফায় বসতে বলে বলল, 'বলো কী খবর।'

www.BDeBooks.Com

আমি বসে বললাম, 'তুমি কি কাল রাত্রে আবার ওষুধটা খেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ, এবং সেই একই প্রতিক্রিয়া,' বলল দানিয়েলি। 'ওষুধ খাবার পরে কী করেছি, কোথায় ছিলাম, কখন ফিরলাম—কিছুই মনে নেই।'

'এক চামচই খেয়েছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি বোধ হয় জান যে কাল ক্রুগার আর গোমেজ খুন হয়েছে, এবং স্টেবিং-এর লাশ পাওয়া গেছে।'

'জানি।'

'এরা তিন জনেই কিন্তু তোমার বক্তৃতায় ঘোর আপত্তি তুলেছিল।'

'তাও জানি।'

'আমার একটা কথা শুনবে ?'

'কী ?'

'ওষুধটা আর খেও না। তুমি যখন নিজে কিছুই অনুভব করছ না, তখন খেয়ে লাভ কী ? বিজ্ঞানের দিক দিয়ে তো তুমি কোনও জ্ঞান আহরণ করছ না। সত্যি বলতে কী, তুমি তো কিছুই জানতে পারছ না।'

'তা পারছি না, কিন্তু একটা যে কিছু হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।'

'কিছু মনে করো না, কিন্তু আমার ধারণা এই তিনটে খুনের জন্যই তুমি দায়ী ; অর্থাৎ তোমার ওষুধই দায়ী।'

'ননসেন্স।'

'ননসেন্স নয়। কেন সেটা আমি বলছি। আমি নিজে একই ওষুধ আবিষ্কার করেছি ভারতবর্ষে আমার ল্যাবরেটরিতে। আমি সেটা আমার পোষা বেড়ালের উপর পরীক্ষা করেছিলাম। ড্রপার দিয়ে এক ফোঁটা ওষুধ তার মুখে ঢেলে দিয়েছিলাম। তিন মিনিটের মধ্যে সে আমাকে আক্রমণ করে জখম করে। তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অবিশ্যি সে আমারই তৈরি একটা অ্যান্টিডোট খেয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।'

দানিয়েলি একটুক্ষণ চুপ করে রইল। আমি লক্ষ করলাম, তার জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তারপর চাপা স্বরে সে বলল, 'তুমি আমার আগে এই ওষুধ আবিষ্কার করেছ ?'

'হ্যাঁ।'

'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

দানিয়েলির কণ্ঠস্বরে এই প্রথম একটা তিক্ততার আভাস পেলাম। সে আবার বলল, 'আই ডোন্ট বিলিভ ইট।'

আমি বললাম, 'তুমি বিশ্বাস না করতে পারো। কথাটা কিন্তু সত্যি। তুমি তোমার ওষুধের উপাদানের কথা আমাকে বলেছ, কিন্তু পরিমাণ বলনি। আমিও এই একই উপাদান দিয়ে ওষুধ তৈরি করেছি, এবং আমার পরিমাণ মুখস্থ আছে। সেটা আমি তোমাকে বলছি। দেখ তোমার সঙ্গে মেলে কি না।'

আমার পুরো ফরমুলাটা কণ্ঠস্থ ছিল। আমি সেটা দানিয়েলিকে বললাম। তার দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। তারপর সে ফিসফিস করে বলল, 'আই কান্ট বিলিভ ইট ; পরিমাণ দুজনের হুবহু এক।'

'তা হলেই বুঝতে পারছ।'

'তুমি নিজে খাওনি তোমার ওষুধ ?'

'না, এবং কোনওদিনও খাব না।'

'কিন্তু আমাকে খেতেই হবে। যতদিন না জানতে পারছি ওষুধ খেয়ে আমার কী হচ্ছে, আমি কী করছি, ততদিন আমাকে এ ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। দরকার হলে পরিমাণ বাড়াতে হবে ; এক চামচের জায়গায় দু চামচ।'

'তুমি কি সত্যিই কিছু বুঝতে পারছ না, ওষুধ খেয়ে তুমি কী কর ?'

'প্রথম দিন কিছুই বুঝিনি। কালকের সামান্য স্মৃতি আছে। আমি জানি, আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমার গাড়িতে উঠেছিলাম।'

'তোমার কি ড্রাইভার আছে ?'

'না। আমি নিজেই গাড়ি চালাই।'

'তারপর কী হয় কিছুই মনে নেই ?'

'না। কিন্তু এইভাবেই আমি আস্তে আস্তে জানতে পারব আমি কী করছি, আমার কী পরিবর্তন হচ্ছে।'

'এর ফল ভাল হবে না, দানিয়েলি।'

'তা না হলেও, বিজ্ঞানের খাতিরে এটা আমাকে করতেই হবে। তুমি আর আমি এক লোক নই। আমার কৌতূহল তোমার চেয়ে অনেক বেশি।'

আমি বুঝলাম দানিয়েলিকে অনুরোধ করে কোনও ফল হবে না। ওর মাথায় ভূত চেপেছে।

আমি বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

আমায় একটা কিছু ভেবে বার করতে হবে। এ দু দিনে দানিয়েলির তিনটি শত্রু খুন হয়েছে। আরও কত শত্রু আছে তার কে জানে ?

২০ এপ্রিল

আজ চতুর্থ খুনের খবর কাগজে বেরিয়েছে। রোমের বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ডাঃ বার্নিনিকে কেউ কাল রাত্রে তার বাড়িতে গিয়ে গলা টিপে মেরে এসেছে। পুলিশ গলায় আঙুলের ছাপ পেয়েছে, সেই অনুসারে তারা অনুসন্ধান চালাচ্ছে।

আমি তো অবাক। এ আবার কে খুন হল ? কেন ?

আমি দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে দানিয়েলির বাড়িতে আলবের্তিকে ফোন করলাম। আলবের্তি ফোন ধরার পর বললাম, 'তুমি একবার আমার হোটেলে আসতে পারবে ? আমার ঘরের নম্বর হচ্ছে ৭১৩। বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে আলবের্তি আমার ঘরে চলে এল।

আমি তাকে প্রথমেই বললাম, 'আমার একটা বিশ্রী সন্দেহ হচ্ছে যে, এ ক'দিন যে খুনগুলো হয়েছে সেগুলো দানিয়েলির কীর্তি। সে ওষুধ খেয়ে এই কাণ্ডটি করছে। তোমার কী মনে হয় ?'

আলবের্তি গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমারও কাল থেকে সেই ধারণা হয়েছে, কারণ যারা খুন হয়েছে তারা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময় দানিয়েলির বিরুদ্ধে কিছু বলেছে, তার কথা বিশ্বাস করেনি বা তার কথার প্রতিবাদ করেছে।'

'কিন্তু কাল রাত্রে যিনি খুন হলেন—এই বার্নিনি ভদ্রলোকটি কে ?'

'ইনি এখানকার একজন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী। দানিয়েলির একটা প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি তিন বছর আগে একটা প্রবন্ধ লেখেন। সেটা একটা পত্রিকায় বেরিয়েছিল।'

www.BDeBooks.Com

'সেই রাগ দানিয়েলি এখনও ভোলেনি ?'

'তাই তো দেখছি। এবং দানিয়েলিকে কোনও না কোনও সময় আক্রমণ করেছেন, এরকম বিজ্ঞানী রোমে অনেক আছে। প্রোফেসর তুচ্চি, ডাঃ আমাটি, ডাঃ মাৎসিনি—আর কত নাম করব ? আমার এখন ধারণা হয়েছে এঁদের প্রত্যেকের উপরই দানিয়েলি রাগ পুষে রেখেছেন। এতদিন কিছু করেননি, কারণ দানিয়েলি এমনিতে খুবই ভদ্র এবং অমায়িক ব্যক্তি। কিন্তু এই ওষুধই হয়েছে ওঁর কাল। আর একটা কথা আমি আপনাকে বলতে চাই।'

'কী ?'

'আপনি বোধ হয় প্রোফেসরের আগে এই ওষুধ তৈরি করেছেন, তাই না ?'

'সেটা তুমি কী করে জানলে।'

'আমি কাল প্রোফেসরের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছিলাম। উনিই বললেন, এবং যেভাবে বললেন তাতে মনে হয় না যে, উনি আপনার উপর খুব প্রসন্ন।'

'তাই কি ?'

'তাই—এবং আমি বলি আপনি সাবধানতা অবলম্বন করুন। রাত্রে আপনার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেবেন না।'

'কিন্তু শুধু তা হলেই তো হবে না। এখানে হত্যাকাণ্ড যে চলতেই থাকবে। এরপর নিরীহ লোককেও দানিয়েলি খুন করতে আরম্ভ করবে সামান্য ছুতো পেলেই।'

'তা হলে কী করা যায় ?'

'সেটাই ভাবছি।'

আমি কিছুক্ষণ ভেবে একটা ফন্দি বার করলাম। বললাম, 'তুমি প্রোফেসরের ল্যাবরেটরিতে যাও ?'

'হ্যাঁ, যাব না কেন ? দিনেরবেলাতে যাই।'

'ওই ওষুধ কি তোমার নাগালের মধ্যে থাকে ?'

'না। ওটা উনি আলমারিতে বন্ধ করে রাখেন। চাবি ওঁর কাছে থাকে।'

আমি আরেকটু ভাবলাম। তারপর বললাম, 'তুমি কি ওর বাড়িতেই থাক ?'

'না। আমি সকাল দশটার সময় আসি, আবার সন্ধ্যা ছটায় বাড়ি চলে যাই।'

'ওর ল্যাবরেটরির চাবি তোমার কাছে আছে ?'

'তা আছে।'

'তা হলে রাত্রে আমাদের দুজনকে ওর ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে। ও যাতে ওষুধ আর না খায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কাল আমি একটু মিলান যাচ্ছি। পরশু সন্ধ্যাবেলা আপনার কাছে চলে আসব।'

'বেশ, তাই কথা রইল।'

আলবের্তি চলে গেল। ঘটনাটা আজকে ঘটলেই ভাল হত, কিন্তু উপায় নেই। আলবের্তিকে প্রয়োজন।

২১ এপ্রিল

আজ দুটো খুনের খবর বেরিয়েছে কাগজে। তারমধ্যে একজনের নাম আলবের্তি কালকে করেছিল। আরেকজন প্রোফেসর বেলিনি—জীববিদ্যাবিশারদ। দুজনকেই রাত্তিরে গলা টিপে মারা হয়েছে। আঙুলের ছাপ আগের খুনের সঙ্গে মিলে গেছে। পুলিশ এটা বুঝেছে

যে, সব খুন একই লোক করেছে। বেলিনির চাকর পুলিশকে বলেছে যে, রাত এগারোটার সময় সে দরজার ঘণ্টা শুনে দরজা খুলে দেখে যে, একজন বীভৎস দেখতে লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতে সে বলে তার নাম আরতুরো ক্রোচে। ক্রোচে বেলিনির সঙ্গে দেখা করতে চায়। বেলিনি তখনও ঘুমোতে যাননি। ক্রোচের নাম শুনে তিনি চাকরকে বলেন লোকটিকে ভিতরে আসতে বলতে। পনেরো মিনিট পরে এই ক্রোচে লোকটি চলে যায়। বেলিনির চাকরই তার হ্যাট আর কোট তাকে এনে দেয়। তারপর মনিব ঘুমোতে যাচ্ছেন না দেখে চাকরটি তাঁর ঘরে উঁকি মেরে দেখে বেলিনি মেঝেতে পড়ে আছেন—মৃত অবস্থায়। সে তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ বেলিনির গলাতে আততায়ীর আঙুলের ছাপ পায়, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আততায়ীর সন্ধান পায়নি।

২৩ এপ্রিল

কাল রাত্রের সাংঘাতিক ঘটনার বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু তাও যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

কাল সকালে রোমের কিছু দ্রষ্টব্য দেখতে বেরিয়েছিলাম একটা টুরিস্ট দলের সঙ্গে। ফিরেছি বিকেল সাড়ে চারটায়। তারপর কফি খেয়ে টাইবারের ধারে হাঁটলাম আধ ঘণ্টা।

রাত সাড়ে আটটা নাগাত আলবের্তি আমার হোটেলে এল। আমরা দুজনে একসঙ্গেই ডিনার খেলাম। তারপর স্থির করলাম সাড়ে দশটা নাগাত দানিয়েলির বাড়ি যাব। বাড়ি যাব মানে বাড়ির বাইরে ওত পেতে থাকব। ল্যাবরেটরিটা বাইরে থেকে দেখা যায়, তাতে আলো জ্বললেই বুঝব দানিয়েলি ঢুকেছে। তখন আমরা বাড়িতে গিয়ে ঢুকব।

দানিয়েলির পাড়াটা এমনিতেই নির্জন—তার উপরে রাত্রে তো বটেই। বাড়ির সামনেই একটা পার্ক আছে ; আমরা দুজনে সেই পার্কের রেলিঙের ধারে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ল্যাবরেটরি অন্ধকার, অথচ বাড়ির অন্য ঘরে আলো জ্বলছে।

বাড়ির দুশো গজের মধ্যেই একটা গির্জা, তাতে সাড়ে দশটার ঘণ্টা বাজার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ল্যাবরেটরির আলো জ্বলে উঠল।

আমি আর আলবের্তি দানিয়েলির বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘণ্টা টিপলাম। চাকর এসে দরজা খুলে আমাদের দেখেই বলল, 'এখন সিনিয়র দানিয়েলির সঙ্গে দেখা হবে না। তাঁর বারণ আছে।'

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলবের্তি তাকে একটা মোক্ষম ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে দিল। আমরা চাকরকে টপকে ভিতরে প্রবেশ করলাম। আলবের্তি বলল, 'ফলো মি।'

সিঁড়ির পাশে একটা ঘর পেরিয়ে একটা প্যাসেজ, সেটা দিয়ে বাঁ দিকে হাতদশেক গেলেই ল্যাবরেটরির দরজা। দরজা অল্প ফাঁক, তা দিয়ে আলো এসে বাইরে পড়েছে, প্যাসেজে কোনও আলো জ্বলছে না।

আমি আলবের্তিকে ফিসফিস করে বললাম, 'আমি ঢুকছি ভিতরে। তুমি দরজার বাইরে থেকো, দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

তারপর ল্যাবরেটরির ভিতরে ঢুকেই দেখলাম দানিয়েলি আমার দিকে পিঠ করে একটা খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে একটা বোতল থেকে চামচে ওষুধ ঢালছে।

'দানিয়েলি !'

আমার গলা শুনে সে চরকিবাজির মতো ঘুরে আমাকে দেখে চোখ কপালে তুলে বলল, 'সে কী, তুমি নিজেই এসে গেছ ? আমি তো তোমার হোটেলেই যাচ্ছিলাম।'

www.BDeBooks.Com

এই বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ওষুধটা খেয়ে ফেলল, আর তারপরে অবাক হয়ে চোখের সামনে দেখলাম, মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারার পরিবর্তন হতে।

সে এখন আর সৌম্যদর্শন বৈজ্ঞানিক নয়, সে হিংস্র চেহারার আধা মানুষ আধা জানোয়ার।

এর পরেই সে আর এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি বিদ্যুদ্বেগে পাশ কাটাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় চরম ফন্দিটা এসে গেল। দানিয়েলি হাতদুটো বাড়িয়ে আবার আমার দিকে লাফ দেবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি আলমারির তাকে রাখা ওষুধের বোতলটা হাতে নিয়ে এক ঢোক ওষুধ মুখে পুরে দিলাম।

তারপর এইটুকু শুধু মনে আছে যে আমি ভীমবিক্রমে দানিয়েলির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছি, এবং দুজনে একসঙ্গে মেঝেতে পড়ছি জড়াজড়ি অবস্থায়। এও মনে আছে যে, আমার দেহে তখন অসুরের শক্তি। এ ছাড়া আর কিছু মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি আমার হোটেলের বিছানায় শুয়ে আছি, আমার সর্বাঙ্গে বেদনা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে আলবের্তি ঘরে ঢুকল।

'আপনি নিজে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না বলে রুমবয়ের কাছ থেকে চাবি নিয়ে

www.BDeBooks.Com

দরজা খুলেছি—আশা করি কিছু মনে করবেন না।'

'গুড মর্নিং,' বললাম আমি।

'আপনি আছেন কেমন ?'

'শরীরে কোনও জখম নেই, কেবল বেদনা।'

'আমি ডাক্তারকে খবর দিয়েছি, সে এসে আপনার ব্যবস্থা করবে।'

'কিন্তু কাল কী হল ?'

'কাল দুই হিংস্র পিশাচকে মরণপণে লড়াই করতে দেখলাম। আমি এসে আপনার পক্ষ না নিলে কী হত বলা যায় না। আমি এককালে বক্সিং করেছি। দানিয়েলিকে একটা আপারকাট মেরে নক আউট করে দিই। তার আগে অবশ্য আপনিও ওকে যথেষ্ট কাবু করেছিলেন। ও অজ্ঞান হলে আমি আপনাকে নিয়ে হোটেলে চলে আসি। যখন আপনাকে বিছানায় শুইয়ে দিই তখনও আপনার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। যতক্ষণ না আমার চেনা প্রোফেসর শঙ্কুকে আমার সামনে দেখতে পাই, ততক্ষণ আমি আপনার ঘরে ছিলাম। তারপর বাড়ি ফিরে আসি। তখন রাত সাড়ে বারোটা।'

'আর দানিয়েলি ?'

এই প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার চলে এলেন। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি কাল কারুর সঙ্গে হাতাহাতি হয়েছিল ?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। তাঁর বাড়ি এই যুবকটি জানে। তিনি থাকেন সাতাশ নম্বর ভিয়া সাক্রামেন্টোতে। তাঁর নাম ডাঃ এনরিকো দানিয়েলি। তিনি তাঁর আবিষ্কৃত একটি ওষুধের প্রভাবে এই দশা করেছেন আমার। গত চার-পাঁচ দিনে যে কজন বৈজ্ঞানিক খুন হয়েছেন, তাঁদের গলার আঙুলের ছাপের সঙ্গে এই দানিয়েলির আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে তাতে কোনও পার্থক্য নেই।'

'এটা তা হলে পুলিশের কেস ?'

'তা তো বটেই।'

'আমি এক্ষুনি পুলিশে খবর দিচ্ছি।'

ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়ে চলে গেলেন।

এবার আলবের্তি তার পকেট থেকে একটা বোতল বার করে টেবিলের উপর রেখে বলল, 'এই হল বাকি ওষুধ। এটা আপনার কাছেই থাক ; আপনার গবেষণাগারে যে বোতলটা রয়েছে সেটার পাশে রেখে দেবেন। আশা করি এখন খানিকটা সুস্থ বোধ করবেন।'

'ওষুধ পড়েছে, আর চিন্তা কী। আমার মনে হয় পরশুর মধ্যেই দেশে ফিরতে পারব। তোমার সাহায্যের জন্য অজস্র ধন্যবাদ। তোমার কথা ভুলব না কখনও।'

সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৯৫

ডন ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী

সেপ্টেম্বর ৬

আজ আমার বন্ধু জেরেমি সন্ডার্সের কাছ থেকে একটা আশ্চর্য চিঠি পেয়েছি। সেটা হল এই—

প্রিয় শঙ্কু,

তোমাকে একটা অদ্ভুত খবর দেবার জন্য এই চিঠির অবতারণা। আমাদের দেশের কাগজে খবরটা বেরিয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে হয়তো বেরোয়নি। ম্যাড্রিডের এক লাইব্রেরিতে একটি অতি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল তিন মাস আগে। স্পেনের বিখ্যাত ভাষাবিদ প্রোফেসর আলফোনসো বেরেটা তিন মাসে এই পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার করেছেন এবং একটি সাংবাদিক সম্মেলনে সেটা সম্বন্ধে বলেছেন। এই পাণ্ডুলিপির লেখকের নাম হল ডন ক্রিস্টোবাল্ডি এবং এর রচনাকাল হল ১৪৮৩ থেকে ১৪৯০। অর্থাৎ আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে। বেরেটা বলেছেন, এই পাণ্ডুলিপিতে ক্রিস্টোবাল্ডি অজস্র ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার অধিকাংশই ফলে গেছে। তুমি তো ফরাসি গণৎকার নস্ট্রাডামুসের কথা জানো। নস্ট্রাডামুস জন্মেছিলেন ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে, এবং তিনিও পদ্যে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, যার অনেকগুলোই ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের লাঞ্ছনা, নেপোলিয়নের উত্থান ও পতন, লুই পাস্তুরের যুগান্তকারী আবিষ্কার, এমনকী আমাদের যুগে হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর আণবিক বোমা বর্ষণ, অষ্টম এডওয়ার্ডের সিংহাসনত্যাগ, হিটলারের অভ্যুত্থান ইত্যাদি অনেক কিছুই নস্ট্রাডামুস সঠিকভাবে বর্ণনা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই স্প্যানিশ পাণ্ডুলিপিতে যা ভবিষ্যদ্বাণী আছে, তা নস্ট্রাডামুসের কীর্তিকে ম্লান করে দেয়। গত পাঁচশো বছরে এমন কোনও বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা নেই যা ক্রিস্টোবাল্ডি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেননি। আমার তো বিশ্বাস, তোমার কথাও তিনি বলে গেছেন : বিংশ শতাব্দীতে এক অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হবে যাঁর নামের আদ্যক্ষর 'এস'—এ তুমি ছাড়া আর কে হতে পারে ?

আমি ম্যাড্রিডে গিয়ে বেরেটার সঙ্গে দেখা করি এবং এই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করি। আমার এই চিঠি লেখার প্রধান কারণ হল ক্রিস্টোবাল্ডির একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণী। তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপে এক প্রাণীর আবির্ভাব হবে, যারা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাত্র তিনশো বছরে মানুষের কীর্তিকে অনেক গুণে অতিক্রম করে যাবে। মানুষ এই প্রাণীর সন্ধান পাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, এবং এই প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা মানুষই দূর করবে।'

প্রশ্ন হচ্ছে—এই প্রাণী কি সত্যিই আছে ? যদি থাকে তবে তারা কোত্থেকে এল, এবং একটি দ্বীপে বাস করে তারা এত অল্প সময়ে বিজ্ঞানে কী করে এতদূর অগ্রসর হল ?

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক বিখ্যাত পর্যটক প্রশান্ত মহাসাগর পরিভ্রমণ করে অনেক কিছু আবিষ্কার করেন। আমি গত এক মাস ধরে ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়ে এইসব

www.BDeBooks.Com

পর্যটকের ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়ে দেখেছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসি পর্যটক জঁ-ফ্রাঁসোয়া লা পেরুজ প্রশান্ত মহাসাগরে পাড়ি দেন। তার বিবরণ তিনি লিখে গেছেন। সেটা পড়তে পড়তে এক আশ্চর্য ঘটনার বর্ণনা পেলাম। লা পেরুজের জাহাজ একবার ঝড়ে পড়ে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে একটা অজানা দ্বীপের কাছে এসে পড়ে। তখন সন্ধ্যা। সেই সময় লা পেরুজ এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখেন। দ্বীপের একটা অংশ থেকে একটি আলোকস্তম্ভ উঠে আকাশে বহুদূরে চলে গেছে। এর কারণ জানার চেষ্টা লা পেরুজ করেননি, কারণ ঝড় থেমে যাওয়ায় তাঁরা আবার কক্ষে ফিরে আসেন।

আলোকস্তম্ভের বর্ণনা পড়লে লেসার রশ্মির কথাই মনে পড়ে। অন্য কোনও আলো এই ধরনের সমান্তরাল স্তম্ভ রচনা করতে পারে না। ভেবে দেখো—এই ঘটনা একশো বছর আগে দেখা, আর মানুষের লেসার রশ্মি আবিষ্কার হল সাম্প্রতিক ঘটনা!

আমার প্রবল আগ্রহ হচ্ছে এই দ্বীপে গিয়ে অনুসন্ধান করার। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, এই প্রাণী সম্পর্কেও ক্রিস্টোবাল্ডির গণনা নির্ভুল। আমাদের মানরো দ্বীপ অভিযানে, আমরা যে যান ব্যবহার করেছিলাম—আমাদের জাপানি বন্ধু হিদেচি সুমা-র তৈরি জেটচালিত সুমাক্রাফ্‌ট—সেই একই যান আমরা এবারও ব্যবহার করতে পারি। সুমাকে বললে ও রাজি হবে না এটা আমার বিশ্বাস হয় না। আর ক্রোল তো পা বাড়িয়েই আছে; এখন বাকি শুধু তোমার সম্মতি। তোমাকে তো চিনি আমি সতেরো বছর ধরে; আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি রাজি হবে।

কী স্থির কর অবিলম্বে জানাও, কারণ অনেকরকম তোড়জোড় আছে। শুভেচ্ছা নিও।

ইতি। জেরেমি

এ ব্যাপারে যে আমার উৎসাহ না হয়ে যায় না, সেটা সন্ডার্স ঠিকই বলেছে। সত্যিই কি এই উন্নতস্তরের প্রাণী, যারা মানুষ নয়, তারা পৃথিবীতে বাস করছে এতদিন ধরে? ডন ক্রিস্টোবাল্ডির এই গণনাও কি নির্ভুল?

আমি এই অভিযানে যোগ দিতে অবশ্যই প্রস্তুত, সে খবর আমি সন্ডার্সকে আজই জানিয়ে দিচ্ছি।

সেপ্টেম্বর ১৩

অভিযানের সমস্ত আয়োজন হয়ে গেছে। সুমা এককথায় রাজি। তার যানই আমরা ব্যবহার করছি, তবে এটা আগেরটার চেয়ে আরও উন্নত ধরনের যান—সুমাক্রাফ্‌ট ২।

আমরা চার জন ছাড়া আরেকজন আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। ইনি হলেন বার্সেলোনার বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর সালভাডর সাবাটিনি। এঁর সঙ্গে আমার একবারই দেখা হয়েছিল ব্রাসেল্‌সের এক বিজ্ঞানী সম্মেলনে। বয়স ষাটের বেশি নয়, পণ্ডিত ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই, তবে কিঞ্চিৎ দাম্ভিক আর একগুঁয়ে। ইনি অভিজাত বংশের সন্তান, তবে এখন অবস্থা অনেক পড়ে গেছে। ক্রিস্টোবাল্ডির পুঁথি ইনি পড়েছেন, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এঁর ধারণা 'এস' নামধারী যে বিজ্ঞানীপ্রবরের কথা ক্রিস্টোবাল্ডি বলে গেছেন, তিনি হলেন উনি নিজে।

আমরা সকলে সিঙ্গাপুরে একত্র হব, তারপর সেখান থেকে রওনা। লা পেরুজের সঙ্গে ক্রোনোমিটার ইত্যাদি নানারকম যন্ত্র ছিল, তাই তিনি এই রহস্যময় দ্বীপের অবস্থান দিয়ে গেছেন। সেটা হল ৪১·২৪ নর্থ বাই ১৬১·৫ ওয়েস্ট। ম্যাপে দেখা যাবে ওখানে কোনও দ্বীপের চিহ্ন নেই। সেটাই অবশ্য স্বাভাবিক।

আমরা ২৫শে সেপ্টেম্বর রওনা হচ্ছি।

সেপ্টেম্বর ২৪, সিঙ্গাপুর

আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি গতকাল। সাবাটিনির কাছে ক্রিস্টোবাল্ডির পুঁথির কথা শুনছিলাম। পুঁথির গোড়াতে ক্রিস্টোবাল্ডি তার নিজের সম্বন্ধে বেশ কিছুটা বলেছে। মেষপালকের ছেলে ছিল সে। তেরো বছর বয়সে সে প্রথম ভবিষ্যতের ঘটনার ইঙ্গিত পায়। তার কথা অবশ্য সকলেই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর একের পর এক অজস্র ভবিষ্যতের ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। সে নিজের চেষ্টায় লিখতে পড়তে শেখে শুধু এইসব ঘটনা লিখে রাখার জন্য। নস্ট্রাডামুসের মতোই সে নিজের মৃত্যুর সন তারিখও আগে থেকে জানিয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৩-এর বাংলার মন্বন্তরের কথা ক্রিস্টোবাল্ডি লিখে গেছে। বাংলার নাম অবশ্য করেনি; প্রাচ্যের একটা প্রদেশ বলে বলেছে। সেই সময় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলেছে, তার সম্বন্ধেও অবিশ্যি অনেক তথ্য আছে। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পও বাদ যায়নি।

সুমা জিজ্ঞেস করল জাপান সম্বন্ধে কোনও ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি না। তাতে সাবাটিনি বলল, 'তোমাদের রাজা হিরোহিতো সম্বন্ধে একেবারে নাম উল্লেখ করে বলা আছে। তিনি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকবেন সে কথাও বলা আছে। তা ছাড়া হিরোশিমা নাগাসাকির কথা তো আছেই। যেমন নস্ট্রাডামুসে ছিল।'

সুমা দেখলাম, এই নতুন প্রাণীর ব্যাপারে একটু সন্দিহান। বলল, 'মানুষ এই বিংশ শতাব্দীতে যা করেছে, এই পৃথিবীতেই কোনও প্রাণী তার চেয়ে বেশি উন্নত কিছু করতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না।' সন্ডার্স আর ক্রোল দুজনেই এ ব্যাপারে যাকে বলে 'ওপ্‌ন-মাইন্ডেড'। ক্রোল বলছে, 'এই প্রাণী যদি থেকেও থাকে, তা হলে আমি প্রথমেই অনুসন্ধান করব এরা অলৌকিককে বিজ্ঞানের আওতায় এনে ফেলতে পেরেছে কি না। আমাদের অনেক বিজ্ঞানীই অলৌকিক ঘটনাকে হেসে উড়িয়ে দেন, অথচ সেগুলো যে কী করে ঘটছে তার কোনও সন্তোষজনক জবাব দিতে পারেন না।'

সন্ডার্সের উৎসাহের অন্ত নেই। ও বারবার বলছে, 'লা পেরুজ যা লিখে গেছে, তা তো মিথ্যা হতে পারে না। সে ছিল অতি বিখ্যাত পর্যটক। কথা হচ্ছে—সেই প্রাণী এখনও আছে কি না। একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—শুধু একটা দ্বীপে নিজেদের আবদ্ধ রেখে পৃথিবীর অন্য কোনও অংশের সঙ্গে যোগস্থাপন না করে একটা জাত কী করে উন্নত অবস্থায় বেঁচে থাকে। টেকনলজিতে উন্নতি করতে গেলে তো যন্ত্রপাতি লাগে। সেই যন্ত্রপাতি তৈরি করার মালমশলা ওই একটা দ্বীপেই রয়েছে?'

এইসব প্রশ্নের কোনও উত্তরই অবশ্য সিঙ্গাপুরে বসে পাওয়া যাবে না। তবে আমার মনেও যে একটা অবিশ্বাস দানা বাঁধেনি তা নয়। এসব ব্যাপারে ধাপ্পাবাজির উদাহরণের অভাব নেই। আমাদের দিনেরই একজন লোক, যে প্রাচীনকালের হাতের লেখা অনুকরণ করতে পারে, সে মাসখানেক পরিশ্রম করলেই একটা পাঁচশো বছরের পুরনো পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলতে পারে। যিনি এই পুঁথি আবিষ্কার করেছেন, তিনি কীরকম লোক সেটা জানা দরকার।

www.BDeBooks.Com

সেপ্টেম্বর ২৭, প্রশান্ত মহাসাগর

আমরা পঁচিশেই রওনা হয়েছি। সুমার এই যানটির কোনও তুলনা নেই। ম্যাপে দেখে আন্দাজ হয়, আমাদের সাড়ে সাত হাজার মাইলের মতো যেতে হবে। আমরা এখন পর্যন্ত দিনে গড়ে পাঁচশো মাইলের মতো চলেছি। দরকার হলে এর চেয়েও বেশি যাওয়া যায়, কিন্তু এখন অবধি সেটার কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। সন্ডার্স একটা খেলা নিয়ে এসেছে, নাম 'লোগোস'। যেটা পাঁচ জনে খেলতে পারে। ইংরাজি শব্দ রচনার খেলা, ভেবেছিলাম সুমা আর সাবাটিনির অসুবিধা হবে, কিন্তু দেখছি এরা ভাষাটা ভাল বলতে না পারলেও, পড়াশুনা করেছে অনেক, ফলে শব্দের স্টক রীতিমতো ভাল। খেলাটা খেলে আমাদের অনেকটা সময় কেটে যায়।

সুমা সঙ্গে করে একেবারে হালের ইলেকট্রনিক আবিষ্কারের কিছু নমুনা নিয়ে এসেছে। তারমধ্যে একটা খুবই চমকপ্রদ। তুমি হয়তো প্যারিসে গেছ বাজার করতে, অথচ ফরাসি ভাষা জান না। তুমি ইংরাজিতে তোমার চাহিদা জানালে। এই যন্ত্র তৎক্ষণাৎ সেটা ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে জানিয়ে দেবে।

আমাদের ওখানে কতদিন থাকতে হবে জানি না। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দশ দিনের মতো জামাকাপড় নিয়ে এসেছি। থাকব প্লাস্টিকের তাঁবুতে আর খাব টিনের খাবার।

অক্টোবর ৩, প্রশান্ত মহাসাগর
৪০·১ নর্থ বাই ১৬১·৫ ওয়েস্ট

আজ আধ ঘণ্টা আগে আমরা এই দ্বীপে পৌঁছেছি। আদৌ যে একটা দ্বীপ রয়েছে এই ল্যাটিচিউড, লঙ্গিচিউডে, তাতেই আমরা উৎফুল্ল। বিচিত্র দ্বীপ। কোনও গাছপালা নেই, সবুজ বলতে কিছুই নেই, কেবল বালি, পাথর আর শুকনো মাটি। মশা ছাড়া কোনও প্রাণীর সাক্ষাৎ পাইনি এখন পর্যন্ত। কোনওরকম সরীসৃপও চোখে পড়েনি, পাখি বা জানোয়ার তো নয়ই।

দ্বীপটা কত বড় সেটা এখনও আন্দাজ করতে পারিনি। তবে এটা প্রায় জোর দিয়েই বলা যায় যে, এখানে যদি কোনও প্রাণী থেকেও থাকে, তা হলে সভ্যতার স্তরে তারা বেশ নীচেই স্থান পাবে। সভ্য মানুষ হলে বাসস্থানের চিহ্ন থাকবে তো! এখানে যতদূর দেখা যায়, একটা বাড়িও চোখে পড়ছে না।

আমাদের সকলেরই মনে একটা আশঙ্কা রয়েছে যে এতদূর এসে হয়তো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে। এখন দুপুর দুটো। আজকের দিনটা যে এখানে থাকা উচিত সেটা সকলেই বোধ করছি। দ্বীপটা একটু ঘুরেও দেখা উচিত। দূরের দিকে চাইলে মনে হয় সে অংশটা, আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার চেয়ে বেশ খানিকটা উঁচু। এবং মোটামুটি মসৃণও বটে।

এখনও লাঞ্চ হয়নি। ক্রোল আর সন্ডার্স মিলে খাবার আয়োজন করছে; আমারও বোধ হয় হাত লাগানো উচিত। লেখা বন্ধ করি।

অক্টোবর ৫

কথাটা লিখেও আনন্দ : আমাদের অভিযান সফল হয়েছে!

এই দুদিনের ঘটনা নিয়ে একটা বই লেখা যায়; আমি ডায়রিতে যতটা পারি লিখছি।

প্রথম দিন লাঞ্চের পর আমরা পাঁচজন বেরোলাম দ্বীপের মাঝের অংশ লক্ষ্য করে। যত হাঁটছি তত বুঝছি যে জমিটা ধীরে ধীরে উঁচু হচ্ছে এবং মসৃণ হচ্ছে। নুড়ি, পাথর ইত্যাদিও ক্রমশ কমে আসছে। এই মসৃণতা কিন্তু এমন দ্বীপের এমন জমিতে স্বাভাবিক নয়। সুমা একবার হাঁটা থামিয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে বসে জমিটার উপর হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করল। ওর মন্তব্য হল, 'ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর একটা জায়গায় এসে পড়লাম, যেটাকে মনে হল দ্বীপের উচ্চতম অংশ। বিশেষ দ্রষ্টব্য হল মাটিতে একটা গোল গর্ত যার ব্যাস আন্দাজ দেড় মিটার। সেটার দিকে এগিয়ে ভাল করে দেখেও বোঝা গেল না তার ভিতর কী আছে। সেটা যে গভীর তাতে সন্দেহ নেই, কারণ চোখে যা দেখা যাচ্ছে তা হল দুর্ভেদ্য অন্ধকার। ক্রোল আধপাগলা লোক, সে গর্তটার কাছে মুখ নিয়ে তারস্বরে চিৎকার করল, 'হোয়েহো!'

কোনও উত্তর নেই, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছে গর্তটা প্রাকৃতিক নয়; এমন নিখুঁত বৃত্ত মানুষ বা মানুষজাতীয় কোনও প্রাণীর কাজ হতে বাধ্য।

আমরা আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলাম। এদিকে জমিটা ক্রমে ঢালু হয়ে নীচে নামছে। আমরা এসেছি প্রায় চার মাইল। এই গর্ত যদি এই দ্বীপের কেন্দ্রস্থল হয়, তা হলে ওদিকেও আন্দাজ চার মাইল জমি তো রয়েইছে।

ঢালুর ওপাশেও আমরা বাসস্থানের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না।

কিছুদূর গিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। গর্তটা দেখে সকলেই উত্তেজিত, কিন্তু তার

www.BDeBooks.Com

মানে কেউই বুঝতে পারছে না।

ক্যাম্পে ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বেজে গেল। এতটা পথ হেঁটে সকলেরই বেশ ক্লান্ত লাগছিল। আমাদের তাঁবুগুলো খাটানো হয়ে গিয়েছিল। তিনটে তাঁবু—একটায় ক্রোল আর সন্ডার্স, একটায় আমি আর সুমা, আর একটায় সাবাটিনি। আমরা যে যার ক্যাম্পে ঢুকে প্লাস্টিকের চাদরে শুয়ে একটু জিরিয়ে নিলাম। সাড়ে পাঁচটায় ক্রোল সকলকে কফি এনে দিল। সাবাটিনির একটা অসুবিধা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে একমাত্র ওকেই মশা কামড়াচ্ছে। সে বারবার শরীরের অনাবৃত অংশে চাপড় মেরে মশা মারার চেষ্টা করছে। বলল, 'আমার রক্তের জাতই এইরকম। আমার দেশেও মশারা আমার রক্ত খেতে খুব ভালবাসে।'

সাড়ে ছটায় প্রশান্ত মহাসাগরের দিগন্তে সারা আকাশে রং ছড়িয়ে সূর্যদেব অস্ত গেলেন। এবার অন্ধকার হয়ে যাবে দেখতে দেখতে। আমি তিনটে ক্যাম্পের জন্য আমার তৈরি তিনটে লুমিনিম্যাক্স ল্যাম্প এনেছি—অন্ধকার হলেই সেগুলো জ্বলবে।

কিন্তু সেই প্রাণীরা যদি থেকেও থাকে, তা হলে কখন তাদের দেখা পাওয়া যাবে ? তারা কি আমাদের দেখাই দেবে না ? মানুষের প্রতি কি তারা বিরূপ ভাব পোষণ করে ?

ক্রোলের তাঁবু থেকে ভেসে আসছে হেঁড়ে গলায় টুকরো টুকরো ভাবে গাওয়া একটা জার্মান গান। সুমা পাশ্চাত্য ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের ভক্ত। সে একটা বেটোফেনের সিমফনির ক্যাসেট বার করে তার যন্ত্রে চাপাতে যাবে এমন সময় একটা চিৎকার শোনা গেল।

'কাম আউট অ্যান্ড সী, কাম আউট অ্যান্ড সী !'

সাবাটিনির গলা।

আমরা হন্তদন্ত হয়ে ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এক শ্বাসরোধ করা দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম।

দ্বীপের যেটাকে আমরা মাঝের অংশ বলে মনে করেছিলাম, সেখানকার জমি থেকে একটা সবুজ আলোকস্তম্ভ বেরিয়ে আকাশের দিকে বহুদূর উঠে গেছে। এটা যে লেসার রশ্মি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই আলোকস্তম্ভই একশো বছর আগে দেখেছিল লা পেরুজ।

সন্ডার্স বলে উঠল, 'ইট মাস্ট বি কামিং আউট অব দ্যাট হোল।'

আমিও তাই সন্দেহ করছিলাম। ওই গর্ত থেকেই এই আলোকস্তম্ভ বেরিয়েছে।

আমার মনে একটা সন্দেহের উদয় হয়েছিল, সেটা এবার বলে ফেললাম।

'আমার মনে হয় এই প্রাণী মাটির নীচে থাকে। তাই বাইরে এদের অস্তিত্বের কোনও চিহ্ন নেই।'

'কিন্তু এদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কীভাবে ?' অসহিষ্ণু ভাবে বলে উঠল সন্ডার্স।

'অ্যান্ড ইন হোয়াট ল্যাঙ্গুয়েজ ?' প্রশ্ন করল সুমা।

ঠিক কথা। এদের তো ইংরিজি জানার কোনও সম্ভাবনা নেই, তা হলে যোগাযোগ হবে কীভাবে ?'

এবার সুমা ক্যাম্প থেকে একটা যন্ত্র নিয়ে এল। একেবারে হালের জাপানি কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। ছোট ক্যামেরার মতো দেখতে, তবে লেনসের জায়গায় একটা ছোট্ট চোঙা রয়েছে।

চোঙার উলটো দিকটা মুখের কাছে এনে সুমা স্বাভাবিক স্বরে কথা বলল, আর সেই কথার তেজ শতগুণ বেড়ে আকাশ কাঁপিয়ে দিল।

'তোমরা যদি ইংরিজি জান তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করো। আমরা মানুষ। তোমাদের বিষয় পড়ে তোমাদের সন্ধানে এসেছি।'

পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে গুরুগম্ভীর তেজস্বী কণ্ঠস্বরে উত্তর এল। এমন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর মানুষের হয় না।

'আমরা জানি তোমরা এসেছ। তোমরা কী ভাষায় কথা বলো সেটা জানার অপেক্ষায় ছিলাম।'

'আমরা তোমাদের বন্ধু,' বলল সুমা। 'আমরা তোমাদের কাছে আসতে চাই। কীভাবে আসব ?'

উত্তর এল, 'তোমরা রশ্মির উৎসের কাছে এসো। ততক্ষণে আমরা ব্যবস্থা করছি।'

আমরা মনে প্রবল উত্তেজনা আর কৌতূহল নিয়ে আলোকস্তম্ভের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কাছাকাছি যেতে আলো ক্রমশ ম্লান হয়ে মিলিয়ে এল। কিন্তু তার পরিবর্তে সমস্ত জায়গাই একটা সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম এই আলোটাও সেই গর্তের ভিতর থেকেই আসছে।

আবার উদাত্ত যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'প্রবেশপথ দিয়ে চলন্ত সিঁড়ি নেমে এসেছে নীচে। তোমরা একে একে নেমে এসো। নীচে তোমাদের বসার ব্যবস্থা হয়েছে।'

সবাই আমার দিকে চাইল। অর্থাৎ আমাকে দলপতি হতে হবে। আমি গর্তের দিকে এগিয়ে এলাম। নীচ থেকে আলো আসছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চলন্ত সিঁড়ি। আমি সিঁড়িতে পা দিতেই নীচে রওনা দিলাম, আমার পিছনে চারজন।

অন্তত পঞ্চাশ গজ নামার পর সিঁড়ির নীচে পৌঁছোলাম। সামনে বিশ হাত দূরেই দেখা যাচ্ছে একটা আলোকিত প্যাসেজ। এই প্যাসেজ ধরে মিনিটখানেক গিয়েই দেখি আমরা একটা গোল ঘরে পৌঁছেছি। এ ঘরও আলোকিত, কিন্তু কোত্থেকে আলো আসছে সেটা বোঝা যায় না। ঘরে ল্যাম্প জাতীয় কিছু নেই। ঘরের মাঝখানে একটা অজানা ধাতুর তৈরি সোনালি টেবিল, আর তাকে ঘিরে পাঁচটা সোনালি চেয়ার। আদেশ শোনা গেল : 'তোমরা বোসো। এই ঘর, এই আসবাব, তোমাদের জন্যই তৈরি করে রেখেছিলাম।'

আমরা পাঁচজনে বসলাম। আবার কথা এল : 'মানুষ আমরা এই প্রথম দেখলাম। যেমন ভেবেছিলাম তার সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। এতদিন যন্ত্রে তোমাদের কথা, তোমাদের গান,

www.BDeBooks.Com

তোমাদের বাজনা শুনে এসেছি। এইবারে আসল মানুষকে দেখলাম।'

'কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?' অসহিষ্ণুভাবে প্রশ্ন করল সাবাটিনি। 'আমরা তোমাদের দেখতে চাই, তোমাদের কাছে আসতে চাই।'

'তা হবে না ।'

'কেন ?'

'আমাদের আকৃতি তোমরা সহ্য করতে পারবে না। আমরা দেখা দেব না। তোমরা কী জানতে চাও বলো।'

'তোমরা কি অন্য কোনও গ্রহ বা উপগ্রহ থেকে এসেছ ?'

'না।'

'তবে ?'

'পৃথিবীতে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল আকস্মিকভাবে—রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। আমাদেরও উৎপত্তি হয়েছে সেরকম আকস্মিকভাবেই। আজ থেকে তিনশো বছর আগে।'

'কিন্তু তোমরা এত অগ্রসর হলে কী করে—মানুষের সংস্পর্শে না এসেও ?'

'আমরা অগ্রসর হয়েই জন্মেছি। এই তিনশো বছরে অবশ্য আমরা নিজেদের চেষ্টায় আরও উন্নত হয়েছি।'

'তোমরা মানে তোমরা সকলে ?'

'হ্যাঁ। আমাদের পরস্পরে কোনও প্রভেদ নেই।'

'কতজন আছ তোমরা ?'

'পনেরো হাজার। তবে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংখ্যা ক্রমে বাড়ছে। ত্রিশ হাজার থাকতে পারে এই ভূগর্ভস্থিত শহরে।'

'তোমরা এই শহর তৈরি করলে কী করে ? উপাদান কোথায় পেলে ? তোমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষার উপাদান কোথা থেকে পাও ?'

'আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে অনেক কিছু করতে পারি। কোনও কিছুর প্রয়োজন হলে আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে সেটা পাবার ইচ্ছা করি। তার ফলে সেটা আমরা পেয়ে যাই। যেসব জিনিসের প্রয়োজন অল্পকালের জন্য, তার স্থায়িত্বও হয় অল্পকাল। যেমন এই চলন্ত সিঁড়ি। সিঁড়ির কোনও প্রয়োজন আমাদের হয় না। ওটা আমরা ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে শুধু তোমাদের প্রয়োজনের জন্য তৈরি করেছি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে ওটা আর থাকবে না। তা ছাড়া রসায়ন আমাদের সব ব্যাপারে সাহায্য করে।'

'প্রকৃতির সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক ?' ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

'কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা জানি প্রকৃতির উপর নির্ভর করা বিপজ্জনক। পৃথিবীতে বহু জায়গায় বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, তার কারণ অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের অভাব। সেইরকম অতিবৃষ্টিতে বন্যা হয়েছে, মানুষের ঘর ভেসে গেছে, বহু মানুষ মরেছে। অর্থাৎ প্রকৃতি মানুষকে হতাশ করেছে, মানুষ তার জন্য কষ্ট পেয়েছে। আমাদের সে সমস্যা নেই।'

'তোমরা অবসর সময়ে কী কর ? তোমাদের সংগীত নেই, খেলা নেই, সাহিত্য নেই ?'

'আমাদের কোনও অবসরই নেই। আমরা সব সময়ই নিজেদের আরও অগ্রসর করতে চেষ্টা করি। আমরা যে স্তরে আছি, মানুষের সেখানে পৌঁছোতে আরও দু'হাজার বছর লাগবে।'

সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াট অ্যাবাউট অ্যানিম্যালস, বার্ডস, ইনসেক্টস অ্যান্ড আদার ফর্মস অব লাইফ ?'

উত্তর এল : 'সেসব কিচ্ছু নেই। শুধু আমরা আছি আমাদের উন্নত জ্ঞান নিয়ে।'

'কিন্তু মশা তো রয়েছে তোমাদের দ্বীপে,' বলল সন্ডার্স।

'মশা ?'

'হ্যাঁ। একরকম ইনসেক্ট। জান না ?'

'এই প্রথম নাম শুনলাম।'

আমি মনে মনে ভাবলাম—তা হলে এখানে চেয়ারে বসেও সাবাটিনি হাত চুলকোচ্ছে কেন ? এখন মনে হচ্ছে যেন আসবার পথেও মাঝ সমুদ্রে সাবাটিনিকে মশা মারার চেষ্টা করতে দেখেছি। আমরা আসার পথে একটা দ্বীপে থেমেছিলাম এঞ্জিনটাকে একটু বিশ্রাম দেবার জন্য। সেখান থেকেই মশার আমদানি হয়নি তো ?

'আমরা যাতে বসেছি, সেটা কী ধাতুর তৈরি ?' প্রশ্ন করল সুমা।

উত্তর এল : 'সোনা।'

আশ্চর্য ! পৃথিবীর সবচেয়ে বড় স্বর্ণখণ্ড হল তুতানখামেনের শবাধার। কিন্তু এই টেবিল তো তার চেয়ে অনেক বড়।

'এখানে স্বর্ণখনি আছে ?' জিজ্ঞেস করল ক্রোল।

'না। সোনা আমরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি করি। আমাদের সব যন্ত্রপাতিই সোনার তৈরি। এখানে সোনার কোনও মূল্য নেই। আমরা জানি মানুষের মধ্যে আছে।'

সাবাটিনি ধরা গলায় বলল, 'সোনা তৈরির ফরমুলা আছে তোমাদের কাছে ?'

'নিশ্চয়ই। না হলে তৈরি হয় কী করে ?'

ক্রোল বলল, 'আমাদের তো একদিন না একদিন দেশে ফিরে যেতে হবে ; তখন তো আমাদের এই অভিজ্ঞতার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তোমাদের অন্তত একজন প্রাণীকে কি আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব না ? অল্প কয়েক দিনের জন্য ? তারপর আবার তাকে ফেরত দিয়ে যাব।'

এবারে একটা হাসির শব্দ পাওয়া গেল। তারপর কথা এল—

'সে যদি তোমাদের সঙ্গে যায়, তা হলে ফেরার কোনও সমস্যা নেই। যানবাহন ছাড়া চলাফেরা করার উপায় আমরা প্রথম থেকেই জানি।'

'তা হলে তোমাদের একজনকে দেবে আমাদের সঙ্গে ?'

'বললাম তো—তার আকৃতি তোমরা সহ্য করতে পারবে না।'

'সে আকৃতি তোমরা বদলাতে পারবে না ? এত কিছু পার, এটা পারবে না ?'

কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতা। তারপর কথা এল—

'আমাদের দুদিন সময় দাও। আজ বিদায়। যেভাবে এসেছ তোমরা সেভাবেই ফিরে যেতে পারবে।'

ক্রোল বলল, 'কিন্তু একটা কথা তো জানা হয়নি।'

'কী ?'

'আমরা যেমন মানুষ, তেমনি তোমাদের নাম কী ?'

'সে নাম তোমাদের জিভে উচ্চারণ হবে না।'

'তা হলে ফিরে গিয়ে তোমাদের কী নামে উল্লেখ করব ?'

দু সেকেন্ড পরে উত্তর এল : 'অটোপ্লাজ্‌ম।'

'আর এই শহরের নাম ?'

'নোভোপলিস বলতে পার।'

এবারে আমার একটা বলার ছিল, সেটা বলে নিলাম। প্রথমে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের এখানে ব্যারাম নেই ?'

www.BDeBooks.Com

'না।'

'তার মানে কোনও ওষুধও নেই ?'

'না।'

'কিন্তু ব্যারামের সম্ভাবনা নেই সেটা কী করে বলছ ? এর পরে যখন আসব তখন আমার তৈরি ওষুধ মিরাকিউরলের বেশ কিছু বড়ি সঙ্গে করে এনে এই টেবিলের উপর রেখে দেব। যদি ব্যারাম হয়, তা হলে সেটা খেলে সেরে যেতে বাধ্য।'

আমি অবশ্য ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণীর কথাটা ভেবেই এটা বললাম।

এরপরে আমরা গোলঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। এরা এয়ারকন্ডিশনিংটা ভালই রপ্ত করেছে, কারণ মাটির নীচে হলেও আমরা অতি আরামদায়ক ঠাণ্ডা উপভোগ করেছি।

সিঁড়ির কাছে এসে দেখি, সেটা এখন নীচ থেকে উপর দিকে যাচ্ছে।

বিচিত্র মনোভাব নিয়ে আমরা ক্যাম্পে ফিরলাম।

সাবাটিনি বলল, 'এখনও কিন্তু প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, এরা মানুষ নয়।'

'সেটা অবশ্য ঠিক,' বলল ক্রোল।

'এরা সবটাই মিথ্যে বলে থাকতে পারে। খাদ্যের সমস্যা এরা কীভাবে সমাধান করেছে সেটা অবিশ্যি বোঝা গেল না। কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে মাটির নীচে গাছপালা ফুল ফল সবই গজানো যায়।'

'আর সোনার ব্যাপারটা ?' সুমা জিজ্ঞেস করল।

সাবাটিনি একটা বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল।

'তুমি কি বিশ্বাস করলে ওই চেয়ার টেবিল সোনার তৈরি ?'

'গোল্ড হ্যাজ এ স্পেশাল কাইন্ড অব স্মেল,' বলল সুমা। 'আমি চেয়ার টেবিল থেকে সে গন্ধ পেয়েছি।'

'হোয়াট ! সোনার গন্ধ ! আমি এমন কথা কস্মিনকালেও শুনিনি।'

'আমি জানি। আমি জেনেশুনেই বলছি,' ঈষৎ রাগতভাবে বলল সুমা।

আমি দুজনকে ঠাণ্ডা করলাম। তারপর বললাম, 'এরা মানুষই হোক আর নতুন প্রাণীই হোক, এরা যখন একশো বছর আগে লেসার রশ্মি আবিষ্কার করেছে, তখন এদের বিজ্ঞান যে অন্য মানুষের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর সেটা স্বীকার করতেই হবে।'

অক্টোবর ৬

আজ আমাদের অটোপ্লাজ্‌মদের ব্যাপারে কিছু করার নেই। আগামীকাল ওরা কী স্থির করল সেটা জানতে পারব। আমরা পাঁচজনে লোগোস খেলে আর সমুদ্রে স্নান করে সময় কাটালাম। আমার মন কিন্তু বলছে এরা মানুষ নয়, এবং এরা যা বলছে তা সবই সত্যি।

সন্ধ্যায় যথারীতি লেসারস্তম্ভ জ্বলে উঠল। আমরা এদের কাছ থেকে কোনওরকম খবর বা বিবৃতি আশা করছিলাম না, কিন্তু আলোকস্তম্ভ জ্বলার একটু পরেই পরিচিত কণ্ঠে ঘোষণা শুনলাম।

'কাল আলো জ্বলার আধঘণ্টার মধ্যে তোমরা চলে এসো। যেমনভাবে এসেছিলে তেমনভাবেই আসবে, যে ঘরে বসেছিলে সে ঘরেই বসবে। কী সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটা তখনই বলব।'

ঘোষণা বন্ধ হবার পর ক্রোল বলল, 'এমনও তো হতে পারে যে আমাদের দেশের কিছু বিজ্ঞানী দেশে আমল না পেয়ে জেদের বশে এখানে এসে ডেরা বেঁধেছে ?'

'কিন্তু দেখলে তো এসক্যালেটর ?' বলল সন্ডার্স। 'এইসব জিনিস তৈরি করার জন্য তো নানারকম ধাতু, লোকজন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন। এসব এরা পেল কী করে ?'

'ইচ্ছাশক্তির কথাটা ভুলো না সন্ডার্স,' আমি মনে করিয়ে দিলাম। 'সত্যিই যদি এদের তেমন উইলপাওয়ার থাকে, তা হলে তার জোরে অনেক কিছুই সম্ভব।'

'দেখা যাক এরা কাল কী বলে,' বলল সুমা।

অক্টোবর ৭

সন্ধ্যাবেলা লেসার রশ্মিটা কখন জ্বলে তার একটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আজ তার আধঘণ্টা আগে রওনা হয়ে পৌঁছোবার ঠিক আগেই আলোকস্তম্ভটা জ্বলে উঠল। তারপর কণ্ঠস্বর শোনা গেল : 'তোমরা চলে এসো।'

আমরা চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আবার সেই গোলঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

'কী স্থির করলে ?' প্রশ্ন করল ক্রোল।

'আমাদের একজন লোক তোমাদের সঙ্গে দেব। তার আকৃতি হবে মানুষের মতো। পোশাকেও তোমাদের সঙ্গে কোনও তফাত করা যাবে না। কেবল বুদ্ধি হবে ওর অটোপ্লাজ্‌মের মতো।'

'ও কি ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে ?'

'না ; কারণ একজনের ইচ্ছাশক্তিতে কোনও ফল হয় না। তোমাদের জন্য চলন্ত সিঁড়িটা তৈরি করতে আমাদের পঞ্চাশজনের উইলপাওয়ার দরকার হয়েছিল।'

'তা হলে তো আর বেশিদিন এখানে থেকে লাভ নেই,' বলল সন্ডার্স। 'আমরা পরশুই সকালে বেরিয়ে পড়তে পারি।'

'কাল তোমরা তা হলে এই সময়েই এসো।'

'ঠিক আছে।'

অক্টোবর ৯

আমরা আজ সকাল সাড়ে আটটায় রওনা হচ্ছি। চটপট কালকের ঘটনাটা বলে নিই।

কাল সন্ধ্যায় আবার সেই গোলঘরে গিয়ে পৌঁছোতে কথা শোনা গেল।

'তোমরা যেই পথ দিয়ে এলে, সেই পথ দিয়েই আমাদের প্রতিভূ তোমাদের কাছে যাচ্ছে। একে তোমরা অ্যাডাম বলে ডেকো। কারণ এ আমাদের তৈরি প্রথম মানুষ। আরেকটা জরুরি কথা তোমাদের মনে রাখতে হবে।'

'কী ?'

'তোমাদের এখান থেকে দেশে ফিরতে কত দিন লাগবে ?'

'তিন সপ্তাহ পরে আমরা লন্ডনে পৌঁছোব।'

'যেদিন পৌঁছোবে, সেদিন থেকে ধরে সাত দিনের জন্য অ্যাডাম মানুষের আকৃতি নিয়ে থাকতে পারে। সাত দিন শেষ হলেই সে আপনিই আমাদের এখানে ফিরে আসবে। আমার বিশ্বাস তারমধ্যে তোমাদের কাজ হয়ে যাবে। ওকে তোমরা আসতে বাধা দিও না। মনে রেখো—ও বলপ্রয়োগ করে কিছু করতে পারবে না। অটোপ্লাজ্‌ম অহিংস প্রাণী। অ্যাডাম নিরস্ত্র অবস্থায় যাচ্ছে তোমাদের সঙ্গে।'

'যদি দেরি হয়ে যায় তা হলে কী হবে ?'

www.BDeBooks.Com

'তার ফল ভাল হবে না। এর বেশি আমি আর কিছু বলব না। আমি লক্ষ করছি তোমরা কেউ কেউ হাতে আংটি পর। আমি অ্যাডামের হাতে পাঁচটা সোনার আংটি পাঠিয়ে দিচ্ছি—পিওর গোল্ড ; টুয়েন্টি-ফোর ক্যারাট। তোমরা সেগুলি গ্রহণ করলে খুশি হব।'

জুতোর শব্দ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি, আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সে পথ দিয়ে একজন সুদর্শন শ্বেতাঙ্গ যুবক প্রবেশ করল।

'গুড ইভনিং জেন্টলমেন, মাই নেম ইজ অ্যাডাম।'

ক্রোল যেন বেশ অবাক হয়েই বলল, 'কিন্তু তুমি আসলে এখানকার প্রাণী তো ?'

'ইয়েস। আই অ্যাম অ্যান অটোপ্লাজ্‌ম।'

'তোমাকে কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা নানারকম প্রশ্ন করবে। তুমি তার জবাব দিতে পারবে তো ?'

'আমার বিশ্বাস আমি পারব।'

'তা হলে কাল সকালে আমরা আমাদের দেশে ফিরে যাচ্ছি। আজ রাতটা তুমি প্রোফেসর সাবাটিনির ক্যাম্পে ঘুমোবে।'

'আমরা ঘুমোই না।'

'যাই হোক, কাল সকালে আমরা রওনা দেব। লন্ডন শহরে সাত দিন থেকে তুমি আবার তোমার দেশে ফিরে আসবে।'

সবশেষে আমি পকেট থেকে একটা বড় বোতলে রাখা এক হাজার মিরাকিউরলের বড়ি টেবিলের উপর রেখে বললাম, 'এই রইল ওষুধ। আশা করি তোমাদের কোনও ব্যারাম হবে না। কিন্তু যদি হয়, তা হলে এই ওষুধ খেলে বুঝতে পারবে যে মানুষও একেবারে পিছিয়ে নেই।'

সন্ডার্স ডাকছে। সুমাক্রাফ্‌ট রেডি।

অক্টোবর ১১

এই দুদিন দেখে বুঝেছি অ্যাডাম ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। আমাদের সকলকে সমীহ করে চলে। সেইসঙ্গে এটাও দেখছি যে 'লোগোস' খেলায় তার মতো অসাধারণ ক্ষমতা আমাদের আর কারুর মধ্যে নেই। ও আমাদের চেয়ে এত বেশি ভাল যে, শেষে খেলা বন্ধ করে দিতে হল। এখন আমরা গল্পগুজব করে আর সুমার ক্যাসেটে বাজনা শুনে সময় কাটিয়ে দিচ্ছি।

সুমার ভিডিও ক্যামেরা ছিল, কিন্তু সেটা সে বারই করেনি। যদিও আমাদের সঙ্গে একটি অটোপ্লাজ্‌ম চলেছে, তার সঙ্গে মানুষের কোনও তফাত নেই দেখে সুমা ছবি তোলার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে।

আমি অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছি। সেটা হল—এরা যদি সত্যিই মানুষ না হয়, তা হলে এরা যতই উন্নত প্রাণী হোক না কেন, সুখ দুঃখ সকাল সন্ধ্যা চন্দ্র সূর্য ফুল ফল রং রস খেলাধুলা পশু পাখি নিয়ে মানুষই ভাল।

নভেম্বর ২, লন্ডন

আমরা কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। আজ অ্যালবার্ট হলে পঞ্চাশ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর দু'হাজার দর্শকের সামনে অ্যাডাম তার পরীক্ষা দিল।

প্রথমেই সুইডেনের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হান্‌স রুডেলবার্গকে অ্যাডাম ধরাশায়ী করল। রুডেলবার্গের সদ্যপ্রকাশিত কিছু গাণিতিক তথ্য অ্যাডাম প্রমাণ করে দিল যে, তাদের দেশে সত্তর বছর আগে থেকে সকলেই জানে। তারপর সে কতকগুলো তথ্যের উদাহরণ দিল, যেগুলো আমাদের গাণিতিকরা এখনও উদ্ভবই করেননি।

এবার লন্ডনের জীবতত্ত্ববিদ ডক্টর কিংকেড মঞ্চে উঠে অ্যাডামকে উদ্দেশ করে বললেন, 'বুঝতেই পারছি আপনাদের বিজ্ঞান খুবই উন্নত, কিন্তু আপনারা নিজেদের মানুষ নয় বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন কেন ? আকৃতিতে তো আপনার সঙ্গে আমাদের একটি যুবকের কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না। আপনি বলছেন, আপনাদের দ্বীপে আপনা থেকেই প্রাণীর উদ্ভব হয়েছিল ; কিন্তু তার চেহারা মানুষের মতো কী করে হয় ?'

অ্যাডাম অত্যন্ত নম্রভাবে জানাল যে এটা তার আসল চেহারা নয়। 'আমাদের চেহারায় মানুষ অভ্যস্ত নয় বলে আমি মানুষের আকৃতি নিয়ে এসেছি।'

দেড় ঘণ্টা চলল ব্যাপারটা। প্রোফেসর ম্যাংকিভিচ, প্রোফেসর ব্রুনিয়াস, জন ডাকওয়র্থ, ডক্টর ভ্যাসিলিয়েফ, রিখ্‌টার শুল্‌ৎস ইত্যাদি ইত্যাদি বাঘা বাঘা পদার্থবিজ্ঞানী, প্রত্নতাত্ত্বিক, জীববিজ্ঞানী, গণিতজ্ঞ, উদ্ভিদবিজ্ঞানী সকলেই অ্যাডামের কাছে হার স্বীকার করলেন। অ্যাডাম যথারীতি ভদ্র ও বিনীতভাবে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিল। অবশেষে যিনি আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি—প্রোফেসর কার্টওয়েল—তিনি বললেন, 'আমরা একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীর চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর ব্যক্তির পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হয়েছি। এবং নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি। আজকের দিনটি যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মিস্টার অ্যাডাম তাঁর আসল আকৃতি আমাদের কাছে প্রকাশ করলেন না, ফলে একটা সন্দেহ রয়ে গেল যে তিনি আসলে মানুষ, এবং মানুষ হয়েই বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সীমানায় পৌঁছেছেন।'

করধ্বনিতে অ্যালবার্ট হল ফেটে পড়ল।

আমরা অ্যাডামকে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সামনের তিন দিন ওকে ব্যস্ত থাকতে

www.BDeBooks.Com

হবে : সাংবাদিক সম্মেলন আছে, গোটাতিনেক টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার আছে। আমি বারবার সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে, ৭ই সন্ধ্যার মধ্যে ওকে ছেড়ে দিতে হবে।

সাবাটিনি অন্য হোটেলে রয়েছে, সে একদিন অ্যাডামকে খাওয়াতে চায়। খাওয়ার ব্যাপারে অ্যাডামকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। তাকে এমনভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে যে, সে দিব্যি মানুষের খাদ্য খেয়ে হজম করছে।

ঠিক হল পরশু, অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর, সকালে টেলিভিশন ইন্টারভিউ-এর পর সাবাটিনি অ্যাডামকে তার হোটেলে নিয়ে যাবে খাওয়ানোর জন্য। সাবাটিনি বলল যে তার দু-তিনটে সিটিং লাগবে অ্যাডামের সঙ্গে, কারণ ম্যাড্রিড ফিরে গিয়ে সে ওখানকার স্প্যানিশ কাগজে অটোপ্লাজ্‌ম সম্বন্ধে বড় করে লিখতে চায়।

নভেম্বর ৪

কাল সাংবাদিক সম্মেলনের ফলে আজ সব খবরের কাগজে বিস্তারিতভাবে অ্যাডামের খবর বেরিয়েছে। তার চেহারা যে হুবহু মানুষের মতো, তাতে 'অটোপ্লাজ্‌ম' সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছে। তবে এটা সকলেই বলেছে যে, এমন একটি অসাধারণ মেধাবী যুবকের এইভাবে আত্মপ্রকাশ একটি যুগান্তকারী ঘটনা।

আমরা অ্যাডামকে যথাসম্ভব আগলে রাখছি। সাবাটিনি ওকে নিয়ে যেতে চাইলেও আমরা সে ব্যাপারে খুব উৎসাহ প্রকাশ করছি না। আরেকটা সিটিং সাবাটিনিকে দিতেই হবে, ও হোটেলে ডিনারের পর। সাক্ষাৎকারের পর সাবাটিনি বলেছে, সে নিজেই অ্যাডামকে আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

নভেম্বর ৬

ক্রোল, সন্ডার্স এবং আমি—তিনজনেই গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি।

কাল রাত্রে ডিনারের পর সাবাটিনির কাছ থেকে অ্যাডাম আমাদের হোটেলে ফেরেনি। সাবাটিনি যে এতটা দায়িত্বজ্ঞানহীন সেটা আমি বুঝিনি। আজ সকালে ওর হোটেলে ফোন করে জানলাম যে, সাবাটিনি আজ ভোরে হোটেল ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছে। আমরা তিন জন বহু হোটেলে টেলিফোন করেও সাবাটিনির সন্ধান পাইনি। অথচ কাল সাত তারিখ। কাল সন্ধ্যায় অ্যাডামকে ছেড়ে দিতে হবে। আজ একটা খবরের কাগজ থেকে একটা বিশেষ সাক্ষাৎকারের জন্য ফোন করেছিল ; তাকেও না করে দিতে হয়েছে।

আজকে আশা করি কোনও সময় সাবাটিনি না হোক, অন্তত অ্যাডাম ফিরে আসবে।

নভেম্বর ৭

ভয়ংকর ঘটনা। এখনও তার জের কাটিয়ে উঠতে পারিনি। সন্ডার্স অনেক অনুসন্ধানের পর জানতে পারে যে, লন্ডনের বাইরে সাসেক্সে সাবাটিনির এক বন্ধু থাকেন। তিনিও স্প্যানিশ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্প্যানিশ শেখান। সন্ডার্সের বিশ্বাস : সেখানে সাবাটিনি এবং অ্যাডাম—দুজনেরই খোঁজ পাওয়া যাবে।

আমি বললাম, 'তা হলে এক্ষুনি চলো। এখন সোয়া তিনটে। আজ সাড়ে ছটার মধ্যে অ্যাডামকে নোভোপলিস ফিরতে হবে।'

ঠিকানা অবশ্যই সন্ডার্স জোগাড় করে এনেছিল। আমরা যখন যথাস্থানে হাজির হলাম, তখন প্রায় সন্ধে। দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। সামনের দরজায় বেল টিপতে একজন চাকর এসে দরজা খুলেই বলল, 'প্রোফেসর আলভারেজ শহরে নেই, প্যারিসে গেছেন।'

'আমরা প্রোফেসর সাবাটিনির খোঁজ করতে এসেছি।' বলল ক্রোল।

'উনি ব্যস্ত আছেন।'

'তা হোক। আমাদের ওঁর সঙ্গে বিশেষ দরকার।'

কথাটা বলতে বলতেই ক্রোল গায়ের জোরে চাকরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

চাকর আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'ওপরে যাবার হুকুম নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে,' ক্রোল তার রিভলভার বার করে চাকরের দিকে তাগ করে বলল।

'কিন্তু... কিন্তু ওনার ঘরের দরজা বন্ধ।'

'কোথায় ঘর ?'

'দোতলায়,' কাঁপতে কাঁপতে বলল চাকর।

আমরা দোতলায় উঠে গিয়ে ডানদিকে একটা বন্ধ দরজা দেখলাম। ক্রোল তাতে ধাক্কা দিল। একবার, দুবার। কোনও ফল হল না। 'সাবাটিনি ! সাবাটিনি !' গলা চড়িয়ে বলল ক্রোল।

www.BDeBooks.Com

কোনও উত্তর নেই।

এবার ক্রোল দরজার কাছে মুখ এনে বলল, 'সাবাটিনি, শেষবারের মতো বলছি দরজা খোলো, না হলে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব।'

তাতেও যখন কোনও ফল হল না তখন ক্রোল দরজার অর্গলের দিকে তাগ করে রিভলভারের ঘোড়া টিপে দিল। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে দরজা ফাঁক হয়ে গেল, আর আমরা তিন জন হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলাম।

আশ্চর্য দৃশ্য। দুটো মুখোমুখি চেয়ার—একটাতে আমাদের দিকে পিঠ করে বসে আছে সাবাটিনি, অন্যটায় হাত পা দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় অ্যাডাম।

আমাদের ঢুকতে দেখে সাবাটিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মুখ বিকৃত করে বলল, 'আর দু মিনিটের মধ্যে আমি জেনে ফেলতে পারতাম, আর তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে!'

'কী জেনে ফেলতে?' জিজ্ঞাসা করল সন্ডার্স।

'দ্য ফরমুলা ফর মেকিং গোল্ড!' ঘর কাঁপিয়ে বলল সাবাটিনি।

'আমি কোনওদিনও বলতাম না,' দৃঢ়স্বরে বলল অ্যাডাম। 'নেভার, নেভার, নেভার—'

এই তৃতীয় 'নেভার'-এর সঙ্গে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। অ্যাডামের সুপুরুষ আকৃতি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বদলে গিয়ে তার বদলে সেখানে এক বিকটদর্শন চোখসর্বস্ব দাঁতসর্বস্ব, নখসর্বস্ব প্রাণীর আবির্ভাব হল। এমন ভয়ংকর কোনও আকৃতি কল্পনাও করা কঠিন। সাবাটিনি সেটা দেখেই অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল। ক্রোল 'মাইন গট!'—বলে আর্তনাদ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এক সন্ডার্সেরই দেখলাম আশ্চর্য সাহস। সে ঘরে থেকে গিয়ে বলল, 'বাঁধনগুলো খুলে দাও, শঙ্কু।'

আমি এগিয়ে গিয়ে প্রাণীর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিলাম। প্রাণীটা রক্তবর্ণ বিশাল চোখ আমাদের দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

তারপর প্রাণীটা তার লোমশ সরু সরু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'টেলিপ্যাথিতে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছিল আমাদের দেশের প্রাণীর সঙ্গে। মশা থেকে আমাদের দেশে ব্যারাম দেখা দিয়েছে। মনে হয় তোমার ওষুধ না হলে কেউই বাঁচত না।—আমি তা হলে আসি।'

শেষ কথাটার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি মনে মনে বললাম, 'ক্রিস্টোবাল্ডির ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভুল প্রমাণিত হল।'

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৬

স্বর্ণপর্ণী

১৬ জুন

আজ আমার জন্মদিন। হাতে বিশেষ কাজ নেই, সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, আমি বৈঠকখানায় আমার প্রিয় আরামকেদারাটায় বসে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আকাশপাতাল ভাবছি। বৃদ্ধ নিউটন আমার পায়ের পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। ওর বয়স হল চব্বিশ। বেড়াল সাধারণত চোদ্দো-পনেরো বছর বাঁচে ; যদিও কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশ বছর বেঁচেছে এমনও শোনা গেছে। নিউটন যে এত বছর বেঁচে আছে, তার কারণ হল আমার তৈরি ওষুধ মার্জারিন। নিউটনকে ছাড়া আমি যে কত একা হয়ে পড়ব সেটা ভেবেই আমি অনেক গবেষণার পর আজ থেকে দশ বছর আগে এই ওষুধটা তৈরি করি।

আমি বললাম আকাশপাতাল ভাবছি, কিন্তু আসলে ভাবছি পুরনো দিনের কথা—এই বয়সে যেটা স্বাভাবিক। পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগে আমাকে লেখা বাবার চিঠিগুলো আমি কালই পড়ছিলাম। সেগুলোর কথা ভেবেই মনটা অতীতের দিকে চলে যাচ্ছে। নানা কারণে বেশ প্রসন্ন বোধ করছি। সাফল্যের স্বাদ আমি পেয়েছি আমার জীবনে তাতে সন্দেহ নেই। কোনও ভারতীয় বিজ্ঞানী দেশেবিদেশে এত সম্মান পেয়েছে বলে তো মনে হয় না। আমার খ্যাতি প্রধানত ইনভেন্টর বা আবিষ্কারক হিসাবে। এ ব্যাপারে টমাস অ্যালভা এডিসনের পরেই যে আমার স্থান, সেটা পাঁচটি মহাদেশেই স্বীকৃত হয়েছে। আমার ইনভেনশনের একটা তালিকা মনে মনে তৈরি করছিলাম। প্রথম হল মিরাকিউরল, বা সর্বরোগনাশক বড়ি (এটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব কেন আমি একা দাবি করতে পারি না, সেটা যথাস্থানে বলব)।

মিরাকিউরলের পরে এল অ্যানাইহিলিন পিস্তল। আমার অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবনে আমাকে অনেকবারই চরম সংকটে পড়তে হয়েছে। আত্মরক্ষার জন্য একটা অস্ত্রের প্রয়োজন, অথচ আমি রক্তপাত সহ্য করতে পারি না। তাই এই পিস্তল, যা শত্রুকে নিহত না করে নিশ্চিহ্ন করে।

www.BDeBooks.Com

এরপরে এল এয়ারকন্ডিশনিং পিল—যা জিভের তলায় রাখলে শরীর শীতকালে গরম আর গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা রাখে। তারপর লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন ; ঘুমের অব্যর্থ বড়ি সমনোলিন ; অতি সস্তায় উজ্জ্বল আলো দেবার জন্য লুমিনিম্যাক্স ; অচেনা ভাষা ইংরেজিতে অনুবাদ করার জন্য লিঙ্গুয়াগ্রাফ ; পাখিকে শিক্ষা দেবার জন্য অর্নিথন...আর কত বলব ?

মিরাকিউরল আবিষ্কার হয় আমার যৌবনে। এই ওষুধকে ঘিরে বেশ কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, যার কোনও সম্পূর্ণ লিখিত বিবরণ নেই, কারণ তখন আমি ডায়রি লিখতে শুরু করিনি। আমার স্ফটিকস্বচ্ছ স্মৃতির উপর নির্ভর করে আজ সেইসব ঘটনার বিষয়ে লিখব ; তবে সেটা করার আগে আমার বাবার বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

বাবার নাম ছিল ত্রিপুরেশ্বর শঙ্কু। গিরিডির অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিকিৎসক ছিলেন তিনি। আয়ুর্বেদিক মতে চিকিৎসা করতেন, লোকে বলত ধন্বন্তরি। বাবা স্বভাবতই রোজগার করেছিলেন অনেক, কিন্তু যতটা করতে পারতেন ততটা নয় ; কারণ পেশাদারি প্র্যাকটিস ছাড়াও উনি সারাজীবন বিনা পয়সায় বহু দরিদ্র রোগীর চিকিৎসা করেছেন। আমাকে বলতেন, 'ক্ষমতা আছে বলেই যে অঢেল উপার্জন করতে হবে তার কোনও মানে নেই। সচ্ছল জীবনযাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন ঠিকই, আর তাতে মানসিক শান্তির পথ সহজ হয়ে যায় ; কিন্তু যাদের সে সংস্থান নেই, সুখে থাকা কাকে বলে যারা জানে না, সারা জীবন যারা দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বা যারা দৈবদুর্বিপাকে উপার্জনে অক্ষম—তাদের দুঃখ যদি কিছুটা লাঘব করতে পারিস, তার চেয়ে বড় সার্থকতা, তার চেয়ে বড় আনন্দ, আর কিছুতে নেই।'

বাবার এই কথাগুলো আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

আমি গিরিডির ইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতায় যাই কলেজে পড়তে। আমি নিজেই বলছি, ছাত্র হিসাবে আমি ছিলাম যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট। শুধু যে জীবনে কোনওদিন সেকেন্ড হইনি তা নয়, এত কম বয়সে বিদ্যায় বুদ্ধিতে এতটা অগ্রসর হবার উদাহরণও বিরল। বারো বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করি ; চোদ্দোয় আই. এস-সি, আর ষোলোয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ভাল অনার্স নিয়ে বি. এস-সি।

পরীক্ষার পাট শেষ করে গিরিডিতে ফিরে এলে বাবা বলেন, 'এত কচি বয়সে তুই আর চাকরির কথা ভাবিস না। অ্যাদ্দিন তো বিজ্ঞান পড়লি। এবার বছরচারেক অন্য বিষয় নিয়ে পড়। শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন—বিষয়ের কি অভাব আছে ? বই এখানে না পাওয়া গেলে, কী চাই বললেই আমি কলকাতা থেকে আনিয়ে দেব।' তারপর একটু ভেবে বললেন, 'তুই যদি চাকরিবাকরি না করে বাকি জীবনটা শুধু রিসার্চেই কাটিয়ে দিতে চাস, তাতেও আমার আপত্তি নেই। তুই আমার একমাত্র সন্তান। আমি চলে গেলে আমি যা সঞ্চয় করেছি তার একটা অংশ ব্যয় হবে লোকহিতকর কাজে ; বাকি সবটাই তুই পাবি। কাজেই—।' আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না, বাবা। তোমার কথামতো আমি চার বছর নানা বিষয় নিয়ে পড়াশুনো করব ঠিকই, কিন্তু তারপরে আমাকে রোজগারের পথ দেখতেই হবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে আমি শান্তি পাব না।' বাবা বললেন, 'বেশ, ভাল কথা। কিন্তু রোজগার যেভাবেই করিস না কেন, যারা দরিদ্র, যারা নিরক্ষর, যারা মাথা উঁচু করে চলতে পারে না, তাদের কথা ভুলিস না।'

বিশ বছর বয়সে কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজে আমি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপকের কাজ পাই। যাদের পড়াতাম তাদের বেশ কয়েকজন আমারই বয়সি। এমনকী, দু-একজনের বয়স আমার চেয়ে বেশি। কিন্তু সেজন্য আমাকে কোনওদিন ছাত্রদের টিটকিরি ভোগ করতে

হয়নি। তার কারণ, এত কম বয়সেও আমার মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাম্ভীর্য এসে গিয়েছিল।

গ্রীষ্ম এবং পুজোর ছুটিতে আমি বাড়ি আসতাম। চাকরি নেবার ঠিক আড়াই বছর পরে একদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসে চাকরের হাতে মাল তুলে দিয়ে বাবার ঘরে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে মুহূর্তের জন্য আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা তাঁর কাজের টেবিলের পাশে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছেন।

আমি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে বাবার নাড়ী টিপে বুঝলাম তিনি সংজ্ঞা হারিয়েছেন, তার বেশি কিছু নয়। আমি তৎক্ষণাৎ চাকরকে ডাঃ সর্বাধিকারীকে ডাকার জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

ডাক্তার আসার আগেই বাবার জ্ঞান ফিরে এল। আমি বাবাকে ধরে ধরে নিয়ে তক্তপোশে শুইয়ে দিলাম। অদ্ভুত লাগছিল, কারণ বাবাকে এর আগে কোনওদিন অসুস্থ দেখিনি। বাবা আমার দিকে চেয়ে ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'এই প্রথম না রে তিলু, এর আগে আরও দু'বার এ জিনিস হয়েছে, তোকে বলিনি।'

'এটা কেন হয়, বাবা ?'

'অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। এর কোনও চিকিৎসা নেই। এ রোগেই একদিন ফস করে চলে যাব।'

পরে জেনেছিলাম বাবার এই রোগকে বলে হার্টব্লক। হার্টব্লকে যাতে মানুষ না মরে, তার ব্যবস্থা আজকাল হয়েছে। পেসমেকার বলে ব্যাটারিচালিত একটা ছোট্ট চতুষ্কোণ যন্ত্র রোগীর বুকে অস্ত্রোপচার করে শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। হার্টের স্পন্দন যাতে স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকে সে কাজটা এই যন্ত্রই করে।

দেড় বছর পরে আমি পুজোর ছুটিতে বাড়ি আসার তিন দিন পরে হার্টব্লকেই পঞ্চাশ বছর বয়সে বাবা মারা যান। আমি যেদিন এলাম, সেদিনই রাত্রে বাবা আমাকে একটা আশ্চর্য ঘটনা বলেন।

রাত্রে খাবার পরে দু'জনে একসঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আছি এমন সময় বাবা বললেন, 'টিক্‌ড়ীবাবার নাম শুনেছিস ?'

'যিনি উশ্রীর ওপারে একটা গ্রামে গাছতলায় বসে ধ্যান করেন ?'

'হ্যাঁ। বেশ নামডাক এ অঞ্চলে। বহুলোক দর্শনের জন্য যায়। সেই টিক্‌ড়ীবাবাকে তাঁর কয়েকজন শিষ্য গত পরশু আমার কাছে এনে হাজির করে। যা বোঝা গেল, বাবা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, তার জন্য আমি যদি কোনও ওষুধ দিতে পারি, তা হলে বাবা অত্যন্ত তুষ্ট হবেন।

'আমি শিষ্যদের ওষুধ বাতলে দিচ্ছি, এমন সময় বাবা হঠাৎ বাংলা হিন্দি মিশিয়ে বললেন, 'তুই হামার চিকিৎসা করছিস, লেকিন তোর পীড়ার কী হবে ?' বাবা কী করে টের পেলেন জানি না। যাই হোক—আমি বাবাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমার পীড়ার কোনও চিকিৎসা হয় না। 'জরুর হোতা !' হাঁপের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন বাবাজি। —'সোনেপত্তীর নাম শুনেছিস ?'

'আমি বুঝলাম বাবা স্বর্ণপর্ণীর কথা বলছেন। গাছ নয়, গাছড়া। চরকসংহিতায় নাম পেয়েছি, কিন্তু আধুনিক যুগে এই গাছড়ার হদিস কেউ পায়নি। সে কথা বাবাজিকে বলতে তিনি বললেন, "আমি জানি সে গাছ কোথায় আছে। যুবা বয়সে আমি যখন কাশীতে থাকতাম, তখন আমার একবার খুব কঠিন পাণ্ডুরোগ হয়। আমার গুরুর কাছে সোনেপত্তীর পাতা ছিল। দুটো শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে খাইয়ে দেন। রাতমে সোনে কা পহলে গটগট পী লিয়া, আউর সুবহ্—রোগ গায়ব ! উপ্‌শম ! —যদি এই গাছ

www.BDeBooks.Com

পেতে চাস, তা হলে চলে যা কসৌলি। সেখান থেকে তিন কোশ উত্তরে আছে একটা চামুণ্ডার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। সেই মন্দিরের পিছনে জঙ্গল, সেই জঙ্গলে এক ঝরনা, সেই ঝরনার পাশে গজায় সোনেপত্তীর গাছ। তোর পীড়ায় ওই এক দাওয়াই কাজ দেবে, আর কোনও দাওয়াই দেবে না।"

'এককালে কত জায়গায় না গেছি গাছগাছড়ার অনুসন্ধানে। কিন্তু নাউ ইট্‌স টু লেট।'

আমি টিক্‌ড়ীবাবার এই আশ্চর্য কাহিনী শুনেই মনস্থির করে ফেলেছিলাম। বললাম, 'তুমি যাবে না বলে কি আমিও যেতে পারি না? আমি কালই কসৌলির উদ্দেশে রওনা দেব। কী বলা যায়—বাবাজির কথা তো সত্যিও হতে পারে। আর তুমি যখন বলছ চরকসংহিতায় এই স্বর্ণপর্ণীর উল্লেখ রয়েছে...'

বাবা একটা শুকনো হাসি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'না রে তিলু, এখন যাস না। কালকা থেকে যেতে হয় কসৌলি—সে কি কম দূর? যেতে আসতে পাঁচ-সাতদিন তো লাগবেই। ফিরে এসে হয়তো দেখবি আমি আর নেই। এখন যাস না।'

দু' দিন পরে সেই হার্টব্লকেই বাবার মৃত্যু প্রমাণ করে দিল যে, তাঁর আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

বাবার অসুখে প্রয়োগ না করতে পারলেও, আমি স্থির করেছিলাম যে স্বর্ণপর্ণীর খোঁজে আমাকে কসৌলি যেতেই হবে। বাবার শ্রাদ্ধের পরেও আমার কলেজ খুলতে আরও দু' সপ্তাহ বাকি ছিল। আমি আর সময় নষ্ট না করে কসৌলির উদ্দেশে রওনা হলাম। কালকা

থেকে ছেচল্লিশ কিলোমিটার দূরে সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে ছোট্ট শহর কসৌলি। কালকা থেকে ট্যাক্সি করে যেতে হয়। শুনেছি খুব স্বাস্থ্যকর স্থান।

আড়াই দিন লাগল গিরিডি থেকে কালকা পৌঁছোতে।

বাবার অকালমৃত্যুতে মনটা ভারী হয়ে ছিল, পাহাড়ের গায়ে নিরিবিলি সুদৃশ্য শহরটায় পৌঁছে খানিকটা হালকা বোধ করলাম।

একটা সস্তা হোটেলে উঠে আর সময় নষ্ট না করে সোজা ম্যানেজার নন্দকিশোর রাওয়ালকে জিজ্ঞেস করলাম চামুণ্ডার মন্দিরের কথা জানেন কি না। 'জানি বই কী', বললেন ভদ্রলোক, 'তবে সেখানে যেতে হলে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে, কারণ ঘোড়ায় চলা পথের ধারেই পড়ে মন্দিরটা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম মন্দিরের পিছনে কোনও জঙ্গল আছে কি না। 'আছে,' বললেন ভদ্রলোক, 'বেশ গভীর জঙ্গল।'

ঘোড়ার ব্যবস্থা নন্দকিশোরই করে দিলেন। এই প্রথম অশ্বারোহণের অভিজ্ঞতা, তবে দেখলাম আমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে না, বরং বেশ মজাই লাগছে। আমার সঙ্গে ঘোড়ার মালিক ছোটেলালও চলছিল আরেকটা ঘোড়ায় ; গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে আমি তাকে বললাম, 'তোমাকে হয়তো ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করতে হবে ; আমার এই জঙ্গলে একটু কাজ আছে।'

'একেলা মৎ যাইয়ে, বাবুজি', বলল ছোটেলাল, 'শের-উর হ্যায় জঙ্গলমে।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে আসতে চাও ?'

'হাঁ, বাবুজি।'

ঘোড়া দুটোকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে আমরা দু'জন জঙ্গলে ঢুকলাম। আমি কী খুঁজছি জিজ্ঞেস করাতে আমি সোনেপত্তীর নাম বললাম। ছোটেলাল বলল ও নাম সে কস্মিনকালেও শোনেনি।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই একটা কুলকুল শব্দ পেলাম। শব্দ অনুসরণ করে পা চালিয়ে এগিয়ে যেতে তিন মিনিটের মধ্যেই ঝরনাটা দেখতে পেলাম। চারিদিক ঘন পাতাওয়ালা গাছের ছায়ায় অন্ধকার, কেবল একটা জায়গায় পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে মাটিতে পড়েছে থিয়েটারের স্পটলাইটের মতো, আর সেই স্পটলাইটে ঝলমল করছে এককোমর উঁচু হলদে পাতায় ভরা একটা গাছড়া। এটাই যে স্বর্ণপর্ণী তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমার মনটা নেচে উঠল। এত অল্প সময়ে আমার অভিযান সফল হবে সেটা ভাবতে পারিনি। কিন্তু এখানে তো দেখছি মাত্র একটা গাছ। খুঁজলে আরও বেরোবে কি ?

প্রায় পনেরো মিনিট ধরে খুঁজেও আর কোনও স্বর্ণপর্ণীর সন্ধান না পেয়ে আমরা ঝরনার ধারে ফিরে এলাম। গাছ পেলে কী করব সেটা আগে থেকেই স্থির করে রেখেছিলাম। সঙ্গে চটের থলিতে কসৌলির বাজার থেকে কেনা একটা কোদাল ছিল। সেটা থলি থেকে বার করে কাজে লেগে গেলাম। উদ্দেশ্য—গাছড়াটাকে শিকড়সুদ্ধ তুলে আমার সঙ্গে গিরিডিতে নিয়ে আসব।

আমাকে কোদাল চালাতে দেখে ছোটেলাল 'আরে রাম রাম !'—বলে আমার অপটু হাত থেকে কোদালটা ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শিকড়সুদ্ধ গাছড়াটা আমার হাতে তুলে দিল।

তিন দিন পরে গিরিডিতে ফিরে এসে প্রথমেই আমার মালি হরকিষণকে ডেকে পাঠালাম। সে এলে পর তার সামনে গাছড়াটা তুলে ধরে বললাম, 'এ জিনিস দেখেছ কখনও ?'

www.BDeBooks.Com

'কভি নেহি,' ভ্রূকুটি করে মাথা নেড়ে বলল হরকিষণ।

আমি বললাম, 'তুমি এক্ষুনি এটাকে বাগানের একপাশে পুঁতে ফেলে এর পরিচর্যা শুরু করো।'

হরকিষণ স্বর্ণপর্ণীটাকে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল এ থেকে দাওয়াই হয় কি না। আমি বললাম, 'বঢ়িয়া দাওয়াই।'

'তব তো এক পেড় সে নেহি হোগা, বাবুজি।'

'এ থেকে আরও গাছ গজায় এমন ব্যবস্থা তুমি করতে পার?'

মালি বলল, 'এ গাছের ডালের একটা বিশেষ অংশে সেটাকে ভেঙে নিয়ে টুকরোটা মাটিতে পুঁতে তাকে তোয়াজ করলে তা থেকে নিশ্চয়ই আরেকটা গাছ গজাবে।'

'তুমি তাই করো,' বললাম আমি।

ওষুধ যখন এনেছি, তখন তার দৌড়টা একবার যাচাই করে দেখা দরকার। টিক্‌ড়ীবাবার গাছের সন্ধানে যখন ভুল ছিল না, তখন অনুমান করা যেতে পারে পাণ্ডুরোগ সারার ঘটনাটাও সত্যি।

যাবার আগে শুনে গিয়েছিলাম যে, আজন্ম গিরিডিবাসী উকিল জয়গোপাল মিত্র গুরুতরভাবে অসুস্থ। উনি বাবার পেশেন্ট ছিলেন ; ওঁর স্ত্রীকে আমি মাসিমা বলি। ফোন করে জানলাম মিত্রমশাইয়ের উদরি হয়েছে, যাকে ইংরিজিতে বলে অ্যাসাইটিস। 'আমি চোখে অন্ধকার দেখছি রে, তিলু!' বললেন জয়ন্তীমাসিমা। 'ডাক্তারেরা সবাই জবাব দিয়ে গেছে।'

আমি স্বর্ণপর্ণীর কথা বলতে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এত ওষুধই তো পড়ল, আরেকটা পড়লে আর ক্ষতি কী ?' বুঝলাম তিনি খুব একটা আশ্বস্ত হয়েছেন তা নয়।

তাও আমি সেদিনই সন্ধ্যাবেলা গেলাম মিত্রমশাইয়ের বাড়িতে, সঙ্গে একটা কাগজের মোড়কে গুঁড়ো করা দুটো স্বর্ণপর্ণীর পাতা। 'আধ কাপ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দিন, মাসিমা। আমি কাল সকালে এসে খোঁজ নেব।'

উৎকণ্ঠায় রাত্রে ভাল ঘুম হল না।

সকালে বৈঠকখানায় এসে বসেছি, চাকর দুখি চা এনে সামনের টেবিলে রেখেছে, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। আমি এক লাফে উঠে গিয়ে ফোনটা তুলে 'হ্যালো' বলতেই জয়ন্তীমাসিমার 'তিলু!' চিৎকারে ফোনটা কান থেকে ইঞ্চিখানেক সরিয়ে নিতে হল। 'তিলু, বাবা তিলু! এসে দেখে যাও—যমের দোর থেকে ফিরে এসেছেন তোমার মেসো!'

তাড়াহুড়ো করে কিছু করব না এটা আমি আগেই ঠিক করেছিলাম। তবে মিত্রমশাইয়ের আরোগ্যের পরে যে আমার ওষুধের খবর গিরিডির চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে, এটা আমি আন্দাজ করেছিলাম। ফলে, চাই বা না চাই, আমাকে কিছু দুরারোগ্য ব্যারামের চিকিৎসা করতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য, সব ক্ষেত্রেই আমার ওষুধ কাজ করেছিল। এই আশ্চর্য ওষুধ কী করে পেলাম সে প্রশ্ন অবিশ্যি আমাকে বহুবার শুনতে হয়েছে। উত্তরে প্রতিবারই আমি একই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছি : বাবা মারা যাবার আগে এ ওষুধ আমাকে দিয়ে যান ; কোথায় পাওয়া, কী নাম, তা জানি না।

ইতিমধ্যে আমার মালির অধ্যাবসায়ের ফলে আমার বাগানের দক্ষিণ দিকে দেয়ালের সামনে মাটিতে এগারোটা স্বর্ণপর্ণী শোভা পাচ্ছে। প্রত্যেকটিতেই প্রতি বছর নতুন করে পাতা গজাবে, তাই সাপ্লাইয়ের অভাব হবে বলে মনে হয় না।

এমন যদি ধারণা দিয়ে থাকি যে, আমি এখন কলকাতার কলেজে অধ্যাপনা ছেড়ে পুরোপুরি ডাক্তারিতে লেগে গেছি, তা হলে সেটা শুধরোনো দরকার। অধ্যাপনা পুরোদস্তুর চলছে। কলকাতায় এখনও কেউ স্বর্ণপর্ণীর কথা জানে না, কারণ আমি কাউকে কিছু বলিনি। তবে হঠাৎ যদি চেনাশোনার মধ্যে শুনি কেউ কঠিন ব্যারামে মরণাপন্ন, তা হলে যাতে তাকে দিতে পারি সেজন্য আমার সঙ্গে সব সময়ই গোটা বারো পাতা থাকে।

একটা ব্যাপারে আমার একটু খুঁতখুঁতেমি ছিল ; শুকনো পাতা গুঁড়িয়ে দুধে মিশিয়ে খাওয়ানোর প্রাচীন পন্থাটা আমার ভাল লাগছিল না। আমি ঠিক করলাম স্বর্ণপর্ণীর বড়ি তৈরি করব।

এক মাসের মধ্যেই আমার পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হল। আমার পঁচিশ বছরের জন্মদিনে গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতে বসে কলের হাতল ঘোরাচ্ছি, আর কলের নীচের দিকে নল

www.BDeBooks.Com

দিয়ে বড়ির পর বড়ি বেরিয়ে টপ টপ করে একটা বাটিতে পড়ছে, এমন সময় বিদ্যুৎঝলকের মতো এই ওষুধের একটা নাম আমার মাথায় এসে গেল—মিরাকিউরল ! অর্থাৎ মিরাক্‌ল কিওর ফর অল কমপ্লেন্টস। সর্বরোগনাশক বড়ি।

এইসময় একটা ঘটনা ঘটল, যেটা বলা যেতে পারে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

আমি তখন কলকাতায়। প্রোফেসরির কাজ নেবার মাসখানেকের মধ্যেই আমি ইংরেজি ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'নেচার'-এর গ্রাহক হয়েছিলাম। এই পত্রিকায় জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা চমৎকার প্রবন্ধ পড়ে আমি লেখক জেরেমি সন্ডার্সকে তার বাসস্থান লন্ডনে একটা চিঠি লিখি। নেচার-এ লেখক পরিচিতিতে বলা হয়েছিল সন্ডার্স দু' বছর হল কেমব্রিজ থেকে বায়োলজি পাশ করে বেরিয়েছে। আন্দাজে মনে হয় সে আমারই বয়সি হবে।

তখন বিলেতে চিঠি যেতে জাহাজে লাগত আঠারো দিন, আর প্লেনে আট দিন। আমি এয়ারমেলেই লিখেছিলাম। সন্ডার্সের উত্তর এল উনিশ দিন পরে। অর্থাৎ সেও এয়ারমেলেই লিখেছে। সে যে আমার চিঠি পেয়ে শুধু খুশি হয়েছে তাই নয়, সে নাকি চিঠিতে এক বিরল বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পেয়েছে। শেষ ক' লাইনে সে জানিয়েছে যে, তার জন্ম হয় ভারতবর্ষের পুণা শহরে।—'আমার ঠাকুরদাদা বত্রিশ বছর ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিলেন। আমি অবিশ্যি সাত বছর বয়সে বাবামার সঙ্গে ইংলন্ডে চলে আসি, কিন্তু সেই সাত বছরের স্মৃতি, আর ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর উপর টান আমার এখনও অম্লান রয়েছে।'

চিঠি লেখালেখি চলল। তৃতীয় চিঠিতে সন্ডার্স লিখল, 'যদিও আমাদের দু' জনেরই বয়স পঁচিশ, আমি বিশ্বাস করি না যে এই বয়সে পত্রবন্ধু হওয়া যায় না। তুমি আমার মতে সায় দাও কি না সেটা জানার অপেক্ষায় রইলাম।'

আমি স্বভাবতই সন্ডার্সের প্রস্তাবে রাজি হলাম। পরস্পরকে ছবি পাঠানো হল, অপ্রতিহতভাবে চলতে লাগল এয়ারমেলে চিঠি যাওয়া আসা।

মাসআষ্টেক চলার পর হঠাৎ আমার একটা চিঠির পর এক মাস পেরিয়ে গেলেও সন্ডার্সের উত্তর এল না।

ঠিক করলাম আরও দু' সপ্তাহ দেখে একটা টেলিগ্রাম করব। সন্ডার্স চাকরি করে না সেটা জানি ; সে এখনও জীববিদ্যা নিয়ে রিসার্চ করছে।

সাত দিনের মাথায় হঠাৎ বিলেত থেকে চিঠি। খামের উপর হাতের লেখা সন্ডার্সের নয় ; কোনও এক মহিলার। চিঠি খুলতে খুলতে মনে পড়ল সন্ডার্স লিখেছিল সে গতবছর বিয়ে করেছে, তার স্ত্রীর নাম ডরথি।

চিঠি খুলে দেখি—হ্যাঁ, লেখিকা ডরথিই বটে।

কিন্তু এ যে নিদারুণ দুঃসংবাদ !—'তোমাকে খবরটা জানাতে আমার কী মনের অবস্থা হচ্ছে বোঝাতে পারব না,' লিখেছে ডরথি। 'তুমি জেরির এত বন্ধু বলেই এ কর্তব্যটা আমার কাছে আরও কঠিন' ...এই ভণিতার পরেই বজ্রাঘাত—'জেরির যকৃতে ক্যানসার ধরা পড়েছে। ডাক্তারের মতে তার মেয়াদ আর মাত্র দু' মাস।'

পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কী করণীয় আমি স্থির করে ফেলেছি। দশটা মিরাকিউরলের বড়ি সেদিনই এয়ারমেলে পাঠিয়ে দিলাম ডরথির নামে, সঙ্গে চিঠিতে কাতর অনুরোধ—'এই পার্সেল পাওয়ামাত্র তুমি তোমার স্বামীকে দুটো বড়ি খাইয়ে দেবে। দু' দিনে যদি কাজ না হয়, তা হলে আরও দুটো। এইভাবে দশটা বড়িই তুমি শেষ করে ফেলতে পারো। যেই মুহূর্তে মনে হবে বড়িতে কাজ দিয়েছে, তক্ষুনি আমাকে টেলিগ্রাম করে জানাবে।'

দেড় মাস কেটে গেল—কোনও খবর নেই। ক্যানসারে কি তা হলে মিরাকিউরল কাজ করে না ? তা হলে তো ওষুধের নাম পালটাতে হবে !

আমি ততদিনে গিরিডি ফিরে এসেছি পুজোর ছুটিতে। সন্ডার্সের কাছে আমার দুটো ঠিকানাই ছিল, এখন কখন আমি গিরিডিতে থাকি আর কখন কলকাতায় থাকি, সেটাও ও জানত।

কালীপুজোর আগের দিন ডরথিকে একটা টেলিগ্রামের খসড়া করে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে সেটায় চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় দুখি ব্যস্ত হয়ে এসে বলল, 'একজন সাহেব এক্ষুনি ট্যাক্সি থেকে নামলেন।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। আমার বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই বৈঠকখানা পড়ে। দরজা খুলে দেখি, একটি স্বর্ণকেশ শ্বেতাঙ্গ সুপুরুষ যুবক ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফোটো বিনিময় হবার দরুন আমরা পরস্পরের মুখ চিনতাম, তাই আমি আর থাকতে না পেরে সন্ডার্সকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, 'তুমি বেঁচে আছ !'

ততক্ষণে আমরা দু'জনেই ঘরে ঢুকে এসেছি, দুখি সন্ডার্সের হাত থেকে তার সুটকেস নিয়ে নিয়েছে। এবার সন্ডার্স আমার পিঠে দুটো চাপড় মেরে ধপ করে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, 'তা যে আছি, সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু সত্যি করে বলো তো—এটা কি কোনও ভারতীয় ভেলকি ? লন্ডনের ডাক্তারি মহলে তো হইচই পড়ে গেছে। কী ট্যাবলেট পাঠিয়েছিলে তুমি আমাকে ?'

আমি দুখিকে কফি করতে বলে স্বর্ণপর্ণীর ঘটনাটা আদ্যোপান্ত সন্ডার্সকে বললাম। সন্ডার্স সবটুকু শুনে কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলল, 'এমন একটা ঘটনা তুমি অ্যাদ্দিন তোমার পত্রবন্ধুর কাছে লুকিয়ে রেখেছ ?'

আমি সত্যি কথাটাই বললাম।

'আমার ভয় হয়েছিল তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে না ; ফলে আমাদের দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান এসে পড়বে।'

'ননসেন্স ! তোমার চিঠিতে যেটা সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়, সেটা হল তোমার চিন্তাধারার স্বচ্ছতা ও গভীরতা। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করব না এ কি হতে পারে ? কী নাম তোমার এই আশ্চর্য ওষুধের ?'

'সংস্কৃত নামটা তো তোমায় বলেইছি ; আমার দেওয়া নাম হল মিরাকিউরল।'

'ব্রাভো !' বলে উঠল সন্ডার্স। 'এর চেয়ে ভাল নাম আর হতে পারে না। ...কিন্তু, আশা করি তুমি এই ওষুধের পেটেন্ট নিয়েছ ?'

আমি 'না' বলাতে সন্ডার্স সোফা ছেড়ে প্রায় তিন ইঞ্চি লাফিয়ে উঠে বলল, 'আর ইউ ম্যাড ? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, এ ওষুধ তোমাকে ক্রোড়পতি করে দেবে ?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'সেটাই আমি চাই না, সন্ডার্স। বৈভবের প্রতি আমার কোনও আকর্ষণ নেই। আমি মোটামুটি স্বচ্ছন্দে সাধারণ জীবনযাপন করতে পারলেই খুশি।'

সন্ডার্স সোফার হাতলে চাপড় মেরে বলল, 'ড্যামিট, শঙ্কু ! তুমি এর জন্য নোবেল প্রাইজ পেতে পার, তা জান ?'

'না, সন্ডার্স ; তা পারি না। তুমি তো শুনলে, এই ওষুধের ব্যাপারে আমি যদি কিছু করে থাকি, সেটা হল এই গাছটাকে খুঁজে বার করা। সেটাও সম্ভব হয়েছে কারণ আরেকজন নির্দেশ দিয়েছিল বলে। আর এর যে গুণ, সে তো প্রকৃতির অবদান। তুমি প্রাইজ দেবে কাকে ?'

'বেশ তো, প্রাইজের কথা ছেড়ে দিলাম ; কিন্তু খ্যাতি বলে তো একটা জিনিস

www.BDeBooks.Com

আছে !—তুমি কি সে সম্বন্ধেও উদাসীন ? মিরাকিউরল যে একমাত্র তোমার কাছেই আছে, আর কারুর কাছে নেই, সেটা তো তুমি অস্বীকার করবে না ? ক্যানসার পর্যন্ত যখন সেরে গেছে, তাতেই বোঝা যায় এ ওষুধের ক্ষমতার দৌড়। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিমান ওষুধের স্বত্বাধিকারী তুমি। তোমাকে দেশবিদেশের লোকে চিনবে না ?'

'তার জন্য তুমি কী করতে বলো আমাকে ?'

'আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই—তুমি আমার সঙ্গে লন্ডন চলো। আমার মিরাক্‌ল কিওরের কথা শুনে শুধু ডাক্তারি মহলে নয়, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও তুমুল আলোড়ন চলছে। তারা তোমাকে দেখতে চায়, তোমার মুখ থেকে এ ওষুধের কথা শুনতে চায়, আর আরও যেটা জানতে চায় সেটা হল এই ওষুধের উপাদানের মধ্যে এমন কী থাকতে পারে যার ফলে এর এত তেজ, রোগজীবাণুনাশক এত শক্তি। এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করিয়েছ তুমি ?'

'না।'

'তা হলে সে কাজটা লন্ডনে করাতে হবে। উপাদানগুলি জানতে পারলে কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরিতে এই ওষধি তৈরি করে বাজারে ছাড়া যেতে পারে। ভেবে দেখো, সেটা মানুষের মনে কতটা ভরসা আনবে। তাই বলছি তুমি চলো আমার সঙ্গে। আধুনিক বিজ্ঞানের ঘাঁটি যে এখন পশ্চিমে, সেটা তো তুমি স্বীকার কর ? বৈজ্ঞানিক হিসাবেও তো তোমার একবার বিলেত যাওয়া দরকার।'

অগত্যা সন্ডার্সের প্রস্তাবে সায় দিতে হল। সত্যি বলতে কী, বিদেশ যাবার বাসনা আমি অনেক দিন থেকে পোষণ করছি, সেটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে তা ভাবিনি।

কলকাতায় গিয়ে সাত দিনের মধ্যে যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

২৫ অক্টোবর ১৯৩৭ আমরা বোম্বাই থেকে পি. অ্যান্ড ও. কোম্পানির জাহাজ 'এস্ এস্ এথিনা'-তে ইংলন্ড রওনা দিলাম। ১৬ নভেম্বর পোর্টসমাউথ বন্দরে জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে এলাম লন্ডনের ভিক্টোরিয়া স্টেশনে। সেখান থেকে টিউব অর্থাৎ পাতালরেলে চড়ে গেলাম হ্যাম্পস্টেড। এই হ্যাম্পস্টেডেই উইলোবি রোডে সন্ডার্সের বাড়ি।

সন্ডার্সের চিঠিতে আগেই জেনেছিলাম, তার বাড়িতে স্ত্রী ছাড়া থাকেন তার মা ও বাবা। বাবা জনাথ্যান সন্ডার্স লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক।

আমাদের দেখে সকলেরই মুখে হাসি ফুটে উঠল। সন্ডার্সের মা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি জেরিকে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছ ; এ ঋণ আমরা কোনওদিন শোধ করতে পারব না।'

দোতলা বাড়ি। তার একতলাতেই গেস্টরুমে আমার জায়গা হল। আমরা পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা ছ'টায়। সাড়ে আটটায় ডিনার (এরা দেখলাম বলে 'সাপার') টেবিলে সন্ডার্স তার প্ল্যান বলল।

'কাল সকালে তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের বন্দোবস্ত করব। তারপর তোমার বক্তৃতার জন্য জায়গা ঠিক করে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেব জনসাধারণকে জানানোর জন্য। অবিশ্যি আমার কিছু চেনা ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের আমি আলাদা করে টেলিফোন করে খবরটা জানিয়ে দেব।'

'বিজ্ঞপ্তিতে কী বলবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'নামে তো কেউই চিনবে না আমাকে।'

সন্ডার্স নির্দ্বিধায় বলল, 'বলব সর্বরোগনাশক যুগান্তকারী ড্রাগ মিরাকিউরলের আবিষ্কর্তা ভারতীয় বিজ্ঞানী প্রোফেসর টি. শঙ্কু তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন।'

আমি বললাম, 'সর্বনাশ! আমি যে কোনওদিনই নিজেকে আবিষ্কারক বলে প্রচার করতে পারব না। সে যে মিথ্যা বলা হবে।'

সন্ডার্স ধমকের সুরে বলল, 'আবিষ্কারক নয় কেন বলছ শঙ্কু? যে গাছের উল্লেখ শুধু প্রাচীন সংস্কৃত ডাক্তারিশাস্ত্রে পাওয়া যায়, কাশীর এক সাধু ছাড়া যে গাছ কেউ কোনওদিন চোখে দেখেনি, সেই গাছের সন্ধানে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সাড়ে ছ' হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে গভীর জঙ্গলে নিজের জীবন বিপন্ন করে কে গিয়েছিল? তুমি, না আর কেউ? তুমি এত বিদ্বান, এত বুদ্ধিমান, এটুকু বুঝতে পারছ না যে, এই গাছ "ডিসকাভার" করে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি?'

এরপর আর আমি কী বলব? প্রোফেসর সন্ডার্স বললেন, 'খাও, শঙ্কু, খাও। মাথা হেঁট করে বসে থেকো না। জেরি যা বলেছে তা ষোলো আনা সত্যি। নিজের যেটুকু প্রাপ্য, সেটা আদায় করে নেওয়াটাই বিচক্ষণ ব্যক্তির কাজ। এ ব্যাপারে বিনয় প্রকাশ আমি মোটেই সমর্থন করি না।'

পরদিন সকালে সন্ডার্স বলল, 'তোমাকে আর আমার সঙ্গে টানব না ; তুমি বরং ডরথির সঙ্গে গিয়ে হ্যাম্পস্টেড হিথে হাওয়া খেয়ে এসো। আর এখান থেকে দশ মিনিটের হাঁটা পথে কবি কিট্‌সের বাড়িটা দেখে এসো।'

হ্যাম্পস্টেড হিথের কথা আগেই শুনেছিলাম। এটা একটা বিস্তীর্ণ ঘাসে ঢাকা অসমতল ময়দান। তার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছি ডরথি আর আমি। নভেম্বর মাস, তাই ঠাণ্ডা বেশ জবরদস্ত।

ডরথি যে অতি বুদ্ধিমতী মেয়ে, সেটা ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিট কথা বলেই বুঝেছি। সেও কেমব্রিজের ছাত্রী, অর্থনীতিতে গ্র্যাজুয়েট। কেমব্রিজেই জেরেমির সঙ্গে ওর আলাপ হয়।

ডরথির কথা শুনে এটা বুঝলাম যে ভারতবর্ষে বসে শুধু খবরের কাগজ পড়ে ইউরোপে কী ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যায় না। গত কয়েক বছরে জার্মানিতে হিটলারের অভ্যুত্থান ও নাৎসি পার্টি সংগঠনের কথা অবিশ্যি জানতাম, কিন্তু সেটা যে কী ভয়ংকর চেহারা নিয়েছে এবং হিটলারের আত্মম্ভরিতা ও তার শাসনতন্ত্রের যথেচ্ছাচারিতা যে কোন স্তরে পৌঁছেছে, সেটা দেশে বসে ধারণা করতে পারিনি। ডরথি বলল, 'ইংরাজিতে পাওয়ার-ম্যাড বলে একটা কথা আছে জান তো? হিটলার সেই অর্থে উন্মাদ। সমস্ত

www.BDeBooks.Com

ইউরোপকে গ্রাস করে সে একটা বিশাল জার্মান রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখছে। তাতে ইন্ধন জোগাচ্ছে ওর সাঙ্গোপাঙ্গরা—গোয়রিং, গোয়বেল্‌স, হিমলার, রিবেনট্রপ...। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ!'

আমি গম্ভীর হয়ে গেছি দেখে ডরথি বলল, 'দেখো তো আমার কী আক্কেল! তুমি এই প্রথমবার লন্ডনে এলে, আর আমি তোমাকে যত সব অলক্ষুণে কথা বলে ভাবিয়ে তুলছি। ভেরি স্যরি, শঙ্কু! চলো কিট্‌সের বাড়ি দেখলে তোমার মন খুশি হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

ডরথি ভুল বলেনি। আমি ভাবতে পারি না যে আমাদের দেশের অতীতের কোনও কৃতকর্মার স্মৃতি এত যত্ন নিয়ে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। ডরথি বলল, 'এটা শুধু ব্রিটেনের বিশেষত্ব নয়; ইউরোপের যেখানেই যাও সেখানেই এ জিনিস দেখতে পাবে।'

সন্ডার্স ফিরল সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। প্রথমেই বলল, 'তোমার বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়ে গেছে পরশু সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাক্সটন হলে। টাইম্‌স আর ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে কাল বিজ্ঞপ্তি বেরোবে। ফোন করে যাঁদের খবর দিয়েছি তার মধ্যে যিনি আমার ক্যানসারের চিকিৎসা করছিলেন— ডাঃ কানিংহ্যাম— তিনিও আছেন। সকলেই উন্মুখ হয়ে আছেন তোমার বক্তৃতা শোনার জন্য।'

'কিন্তু আমার বড়ির অ্যানালিসিসের কী খবর?'

সন্ডার্স পকেট থেকে একটা খাম বার করে আমাকে দিল। খাম থেকে যেটা বেরোল, সেটাই হল অ্যানালিসিসের রিপোর্ট। আমি তাতে কিছুক্ষণ চোখ বুলিয়ে বললাম, 'এ তো দেখছি সবরকম ভিটামিনই রয়েছে। তা ছাড়া পোট্যাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, আয়োডিন ...দেখে অনেকটা মনে হয় যেন রসুনের উপাদানের তালিকা দেখছি।'

সন্ডার্স বলল, 'অ্যালিল সালফাইড রয়েছে বলেই এতরকম রোগের জীবাণু এর কাছে পরাস্ত হয়।'

'কিন্তু রিপোর্টের শেষে যে কথাটা বলা হয়েছে, সেটা তো অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বলছে, একটি উপাদান রয়েছে এই বড়িতে, রসায়নে যার কোনও পরিচিতি নেই।'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল সন্ডার্স। 'এবং সেই কারণেই ল্যাবরেটরিতে কৃত্রিম উপায়ে এই ওষুধ তৈরি করা যাবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই এই ওষুধের সোল প্রোপ্রাইটার। তোমার জায়গা কেউ কোনওদিন নিতে পারবে না।'

কথাটা শুনে আমার মনে একটা মিশ্র ভাব দেখা দিল। মিরাকিউরল আমার একার সম্পত্তি এটা ভাবতে খারাপ লাগছে না; কিন্তু এও তো ঠিক যে, যেহেতু ওষুধটা বাজারে ছাড়া যাবে না, পৃথিবীর কোটি কোটি মুমূর্ষু ব্যক্তি এর রোগনাশক ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হবে।

এর পরের দিন সন্ডার্সের সঙ্গে বেরিয়ে লন্ডনের অনেক কিছু দ্রষ্টব্য—ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারি, মাদাম ত্যুসোর মিউজিয়াম—দেখে সন্ধ্যায় মারমেড থিয়েটারে বার্নার্ড শ'র 'পিগম্যালিয়ন' নাটক দেখলাম। সব মিলিয়ে এটা বলতে পারি যে লন্ডন আমাকে হতাশ করেনি।

আমার বক্তৃতায় এত লোক হবে সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। সন্ডার্স আমার সঙ্গে মঞ্চে উঠে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সন্ডার্সেরই অধ্যাপক রেমন্ড ক্যারুথার্স মিটিং-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। সন্ডার্স তাঁকে আগেই তালিম দিয়ে রেখেছিল। তিনি 'ব্রিলিয়ান্ট ইয়াং ইন্ডিয়ান সায়ান্টিস্ট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু' সম্বন্ধে দু-চার কথা বলার পর আমার বলার পালা এল।

বিশ বছর বয়স থেকে ছাত্র পড়াচ্ছি বলে বক্তৃতার ব্যাপারে আমার কোনও অস্বস্তিবোধ ছিল না। তাই আমি বেশ সহজভাবেই বলে চললাম, ভারতে আয়ুর্বেদ চর্চার কথা, চরক-সুশ্রুতের সংহিতার কথা, আমার বাবার কথা, এবং টিক্‌ড়ীবাবার কাছে শুনে কীভাবে কসৌলির জঙ্গল থেকে স্বর্ণপর্ণী সংগ্রহ করি তার কথা। যতক্ষণ বললাম, ততক্ষণ হলে কেউ টুঁ শব্দটি করেনি। বলা শেষ হলে পর করধ্বনির বহর থেকে বুঝলাম আমি উতরে গেছি।

বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তরের জন্য কিছুটা সময় রাখা হয়েছিল, কিন্তু যে দুটো সবচেয়ে স্বাভাবিক প্রশ্ন—এক, আমি ওষুধটা মার্কেট করব কি না, এবং দুই, আমি কিছুকাল লন্ডনে থেকে চিকিৎসা চালাব কি না—এই দুটোর উত্তরই আমার বক্তৃতার মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। তাই বক্তৃতার শেষে দু' মিনিট অপেক্ষা করে সন্ডার্স আমাকে নিয়ে মঞ্চ থেকে নীচে নেমে এল। বহু লোকের সঙ্গে করমর্দন করে এবং অন্তত পঞ্চাশজনের কনগ্র্যাচুলেশন্‌স-এ 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে তবে আমি রেহাই পেলাম।

পরদিন দেখলাম লন্ডনের সব কাগজেই আমার ছবি সমেত খবরটা বেরিয়েছে। বিকেলের দিকে সন্ডার্স বেরিয়ে কাছেই একটা বইয়ের দোকান থেকে জার্মান, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান, সুইডিশ ইত্যাদি যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষায় ডজনখানেক খবরের কাগজ নিয়ে এল। সেইদিনেরই কাগজ, কিছুক্ষণ আগে এয়ারমেলে এসেছে।

উলটেপালটে দেখা গেল প্রত্যেকটি কাগজেই খবরটা বেরিয়েছে এবং তার সঙ্গে প্রত্যেকটি কাগজেই আমার ছবি।

আমি হকচকিয়ে গেছি দেখে সন্ডার্স বলল, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই শঙ্কু। ক্যাক্সটন হলে বহু কাগজের রিপোর্টার উপস্থিত ছিল। তুমি ভুলে যাচ্ছ হে, মিরাকিউরল আবিষ্কারের মতো এমন চাঞ্চল্যকর ঘটনা সম্প্রতি আর ঘটেনি। তুমি এবং তোমার স্বর্ণপর্ণীকে কোনও কাগজ অগ্রাহ্য করতে পারে না।'

www.BDeBooks.Com

এখানে শনি রবি হল উইক-এন্ড। এই দুটো দিন খুব কমই লোক লন্ডনে থাকে ; ইংলন্ডেই কোথাও না কোথাও চলে যায় নির্ঝঞ্ঝাটে দু' দিন কাটিয়ে আসতে। সন্ডার্স আগেই বলে রেখেছিল যে এই উইক-এণ্ডে সে আমাকে কেমব্রিজ ও অক্সফোর্ড দেখিয়ে আনবে। শনিবার কেমব্রিজ, সেখানে কোনও হোটেলে থেকে রবিবারে অক্সফোর্ড দেখে বাড়ি ফেরা।

এ ব্যাপারে ডরথিও আমাদের সঙ্গে এল। সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দুটো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কোনটা যে বেশি ভাল বলা খুব কঠিন, যদিও শহর হিসেবে কেমব্রিজের শান্ত সৌন্দর্য অক্সফোর্ডকে ছাপিয়ে যায়। সন্ডার্স ও ডরথি দুজনেই কিংস কলেজ থেকে পাশ করেছে। দেখে মনে হল পড়াশুনার পক্ষে এর চেয়ে ভাল পরিবেশ আর হতে পারে না।

রবিবার বিকেলে সাড়ে চারটায় বাড়ি ফিরে সদর দরজা দিয়ে ঢুকতেই ডরথির মা ব্যস্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'শঙ্কুর সঙ্গে দেখা করার জন্য একটি বিদেশি যুবক প্রায় আধ ঘণ্টা হল বসে আছে।'

'বিদেশি মানে ?' সন্ডার্স জিজ্ঞেস করল।

'সেটা তোমরা বুঝবে। আমাদের মতো ইংরেজি বলে না এটা বলতে পারি।'

বৈঠকখানায় ঢুকতে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি যুবক, তার চোখে চশমা, মাথা ভর্তি সোনালি চুল।

"গুটেন—গুড ইভনিং ;' বলল ছেলেটি। বুঝতে পারলাম ছেলেটি জার্মান কিংবা অস্ট্রিয়ান, 'গুটেন আবেন্ড' বলতে গিয়ে মাঝপথে সামলে নিয়ে ইংরেজি বলছে। এখানে বলে রাখি যে, বি. এস.সি পাশ করার পর যে চার বছর বসে ছিলাম, সেই অবসরে আমি লিঙ্গুয়াফোন রেকর্ড গ্রামোফোনে বাজিয়ে বাজিয়ে ফরাসি আর জার্মান শিখে নিয়েছিলাম।

ডরথি আর আমাদের সঙ্গে আসেনি ; আমরা তিন জন সোফায় বসার পর কথা আরম্ভ হল। ছেলেটি প্রথমেই ইংরেজি ভাষায় সড়গড় না হবার জন্য মার্জনা চেয়ে নিল।

'আমার নাম নরবার্ট স্টাইনার,' বলল ছেলেটি, 'আমি বার্লিনে থাকি ; সেখান থেকেই আসছি।' তারপর সটান আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিরাকিউরলের খবর আমাদের কাগজে বেরিয়েছে এবং এটা নিয়ে সকলেই আলোচনা করছে। এই আশ্চর্য ড্রাগের ব্যাপারেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি যেখানে বক্তৃতা দিয়েছিলে সেই ক্যাক্সটন হলে ফোন করে আমি জানি যে তুমি হ্যাম্পস্টেডে আছ। এখানে এসে হাই স্ট্রিটে একটা ওষুধের দোকানে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মিঃ সন্ডার্স উইলোবি রোডে থাকেন।'

'তোমার আসার কারণটা জানতে পারি কি ?' সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

'তার আগে আমি দুটো প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী ?'

'নাৎসিরা যে ইহুদিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে সেটা জান ?'

এ খবর আমি দেশে থাকতে পেয়েছি। হিটলারের ধারণা ইহুদিরা বহুদিন থেকে জার্মানির নানারকম ক্ষতি করে আসছে ; সুতরাং তাদের উৎখাত না করলে জার্মানি তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে না। হিটলারের মতে ইহুদিরা মানুষই নয় : আসল মানুষ হচ্ছে সেইসব জার্মান, যাদের শিরায় এক ফোঁটা ইহুদি রক্ত নেই। এই অজুহাতে তারা ইহুদিদের উপর নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে। অথচ জার্মানির জ্ঞানীগুণীদের মধ্যে যাদের স্থান সবচেয়ে উপরে, তাদের অনেকেই ইহুদি।

সন্ডার্স বলল, 'আমরা এ অত্যাচারের কথা জানি। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কী ?'

'তোমরা হাইনরিখ স্টাইনারের নাম শুনেছ ?'

হাইনরিখ স্টাইনার ? এ নাম যে আমার চেনা। বললাম, 'যিনি সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন ? যিনি বেদ উপনিষদ নতুন করে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছেন ?'

'হ্যাঁ,' বলল নরবার্ট স্টাইনার। 'আমি তাঁর কথাই বলছি।'

'তিনি তোমার কে হন ?'

'বাবা। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। নাৎসিরা জার্মানির সব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদিদের তাড়িয়ে দিয়েছে। গেস্টাপোর নাম শুনেছ ?'

এ নামও আমার জানা। বললাম, 'জার্মানির গুপ্ত পুলিশ ?'

'হ্যাঁ। নাৎসি পার্টিতে হিটলারের পরেই যার স্থান, সেই হেরমান গোয়রিং-এর সৃষ্টি এই গেস্টাপো। এই পুলিশবাহিনীর প্রতিটি লোক এক একটি মূর্তিমান শয়তান। কোনও কুকার্যে এরা পেছপা হয় না।'

'তোমার বাবা কি— ?'

'হ্যাঁ। এদের শিকার। বাবা বেশ কিছুদিন থেকেই জার্মানি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভাবছিলেন, কিন্তু বার্লিন ওঁর জন্মস্থান, আর ওঁর ছাত্ররা ওঁকে যেরকম ভালবাসে আর ভক্তি করে—উনি দোটানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। দু' দিন আগে গেস্টাপোর সশস্ত্র পুলিশ আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। তখন দুপুর, আমরা খেতে বসেছি। একজন পুলিশ খাবার ঘরে এসে বাবার দিকে পিস্তল উঁচিয়ে বলে, "বলো—হাইল হিটলার।"

আমি জানতাম যারা হিটলারের আনুগত্য স্বীকার করে, তারা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে ডান হাত সামনের দিকে উঁচিয়ে 'হাইল হিটলার' বলে। এর মানে যদি করা যায় 'হিটলার জিন্দাবাদ', তা হলে খুব ভুল হবে না।

নরবার্ট বলে চলল, 'বাবা বারবার আদেশ সত্ত্বেও হাইল হিটলার বলতে রাজি হননি। তখন পুলিশ তাঁকে আক্রমণ করে। বেপরোয়াভাবে প্রহার করে পুলিশ যখন চলে যায়, তখন বাবা অর্ধমৃত। তাঁর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, মাথা ফেটে গেছে। বার্লিনের কোনও হাসপাতালে

www.BDeBooks.Com

ইহুদিদের ঢুকতে দেয় না। আমাদের বাড়ির ডাক্তার হুবারমানও ইহুদি—তিনি বাড়ি থেকে বেরোন না। পরিচর্যা যেটুকু করার সেটা করেছি আমার বোন আর আমি। কিন্তু বাবা যে অবস্থায় রয়েছেন, ভুল বকছেন, গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে—তাতে মনে হয় না তিনি আর দুএক দিনের বেশি বাঁচবেন। গতকাল কাগজে আমি প্রোফেসর শাঙ্কু আর মিরাকিউরলের কথা পড়লাম।'

নরবার্টের কাতর দৃষ্টি এবার আমার দিকে ঘুরল।

'এক, যদি আপনি বাবাকে বাঁচান...'

সন্ডার্স বলল, 'তুমি কি প্রোফেসরকে বার্লিন নিয়ে যেতে চাইছ ?'

'না হলে বাবা বাঁচবেন না, মিঃ সন্ডার্স! আর বাবা হলেন সত্যিকার ভারতপ্রেমিক। সাতবার ভারতবর্ষে গেছেন। বলেন, সংস্কৃত ভাষায় যে ঐশ্বর্য আছে তেমন আর কোনও ভাষায় নেই। ...আমি টাকা নিয়ে এসেছি। কাল দুপুরে হেস্টন থেকে বার্লিনের প্লেন ছাড়বে সাড়ে এগারোটায়, বিকেল সাড়ে চারটায় বার্লিন পৌঁছোবে। আমাদের বাড়িতেই থাকবেন প্রোফেসর। আমিই আবার দুদিন পরে ওঁকে প্লেনে তুলে দেব। ওঁর এক পয়সা খরচ লাগবে না।'

'কিন্তু ওঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা হবে ?'

'ভারতবাসীদের উপর তো নাৎসিদের কোনও আক্রোশ নেই,' বলল নরবার্ট। 'ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না এ আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।'

সন্ডার্স কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল, 'তোমার বাবাকে কি দেখলে ইহুদি বলে বোঝা যায় ?'

'তা যায়।'

'ওঁর চুল কি কালো ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তোমার চুল সোনালি হল কী করে ? তোমার মা-র চুল কি তোমার মতো ?'

'না, মা-র চুলও কালো ছিল। উনি মারা গেছেন পাঁচ বছর আগে।'

এই বলে নরবার্ট তার চুলের একটা অংশ ধরে টান দিতে সোনালি পরচুলা খুলে গিয়ে কালো চুল বেরিয়ে পড়ল।

'এবার বুঝতে পারছ কেন আমি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি ? আর তা ছাড়া স্টাইনার নাম শুধু ইহুদিদের হয় না, অন্যদেরও হয়। আমি বলছি ওঁর কোনও বিপদ হবে না।'

আমি মনে মনে ভাবছিলাম বাবা বেঁচে থাকলে বলতেন, 'তুই যা রে তিলু। একজন মনীষীর ত্রাণকর্তা হতে পারলে তোর জীবন ধন্য হবে।'

সন্ডার্সকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম ও সবিশেষ চিন্তিত। এবার ও আমার দিকে ফিরে বলল, 'তোমার কী মত, শঙ্কু ?'

আমি বললাম, 'এত বড় একজন ভারততাত্ত্বিককে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করতে পারলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।'

'তবে যাও,' বলল সন্ডার্স, 'কিন্তু দু' দিনের বেশি কোনওমতেই থাকবে না। তোমাকেও বলছি, নরবার্ট—যদি ঈশ্বরের কৃপায় এবং মিরাকিউরলের গুণে তোমার বাবা পুনর্জীবন লাভ করেন, সে খবরটা তুমি ঢাক পিটিয়ে লোককে বলতে যেও না। তা হলে প্রোফেসরকে আরও ডজনখানেক মুমূর্ষু ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য অনির্দিষ্টকাল বার্লিনে থেকে যেতে হবে।'

'আমি কথা দিচ্ছি সেটা হবে না।'

নরবার্ট উঠে পড়ে বলল, 'আমি কাল সকাল দশটায় ট্যাক্সি নিয়ে এখানে এসে হাজির

হব।'

নরবার্ট চলে গেলে সন্ডার্স আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মিরাকিউরলের ক'টা বড়ি এনেছ ?'

'চব্বিশটা।'

'সেগুলো কোথায় থাকে ?'

'আমার সুটকেসে একটা শিশির মধ্যে। কারুর চিকিৎসা করতে যাবার সময় আমি চারটে বড়ি সঙ্গে নিয়ে নিই। তবে বার্লিনে অবিশ্যি আমার সঙ্গে সব বড়িই থাকবে ; চারটে থাকবে পকেটে, আর বাকি ব্যাগে।'

'যে ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় করছে সেটা হল এই—জার্মানিতে তোমার খবর পৌঁছে গেছে সে তো তুমি দেখলেই ; ধরো যদি বার্লিন গিয়ে তুমি নাৎসিদের খপ্পরে পড় ? তাদের মধ্যে তো অনেকেরই দুরারোগ্য ব্যাধি থাকতে পারে। তাদের কেউ তোমার ওষুধের উপকারিতা ভোগ করছে এটা ভাবতে আমার আপাদমস্তক জ্বলে যায়।'

'তুমি কোনও চিন্তা করো না, সন্ডার্স। খবরের কাগজের ছবি থেকে মানুষ চেনা অত সহজ নয়। তা ছাড়া বার্লিনে আমার বয়সি আরও অনেক ভারতীয় আছে, যারা সেখানে পড়াশুনো করছে। আমাকে কেউ মিরাকিউরলের শঙ্কু বলে চিনবে না, দেখে নিও।'

সন্ডার্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঠিক আছে, তবে এটা জেনো যে তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার সোয়াস্তি নেই।'

সন্ডার্স একটা জীবতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখছিল, বলল, 'যাও, তুমি আর ডরথি একটু ঘুরে এসো।'

কোনও বিশেষ জায়গায় যাবার ছিল না। তাই ডরথি আর আমি হ্যাম্পস্টেডেই এদিক ওদিক একটু ঘুরে দেখলাম। একটা রেস্টোরান্টে বসে কফি খেতে খেতে ডরথি বলল, 'আমার জার্মানি আর জার্মান জাতটার উপর এমন ঘৃণা ধরে গেছে যে কেউ ওখানে যাচ্ছে শুনলেই আমি বাধা না দিয়ে পারি না। অবিশ্যি তোমার ব্যাপারটা আমি বুঝতে পারছি। হাইনরিখ স্টাইনারের প্রতি তোমার শ্রদ্ধার ভাব থাকাটা স্বাভাবিক।'

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষের শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে অনেক জার্মানই শ্রদ্ধাশীল। আর সেটা আজ থেকে নয়। দুশো বছর থেকে। আমাদের বিখ্যাত প্রাচীন সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা জার্মানে অনুবাদ হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায়।'

'তখন মধ্যাহ্নের সূর্য জার্মানির মাথার উপরে, শঙ্কু। এখন সে দেশে অন্ধকার, লোকেরা সব অন্ধ, তাই তো হিটলারের স্বরূপ তারা দেখতে পায় না।'

ডিনারের পর বৈঠকখানায় বসে কফি পান ও গল্পগুজব করে আমার ঘরে চলে গেলাম জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। সুটকেসটা সবে বিছানার উপর তুলেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। খুলে দেখি সন্ডার্স।

'আসতে পারি ?'

'নিশ্চয়ই।'

সন্ডার্স ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করল।

'আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস আছে তোমার ?'

'পিস্তল বন্দুকের কথা বলছ ?'

'হ্যাঁ।'

আমাকে বলতেই হল সে অভ্যাস আমার নেই। 'সত্যি বলতে কী, আট-দশ বছর বয়সে আমার গুলতিতে খুব ভাল টিপ ছিল। সাধারণত ওই বয়সে ছেলেরা গুলতি দিয়ে পাখিটাখি

www.BDeBooks.Com

মেরে আস্ফালন করে। আমি কিন্তু কোনওদিন কিছু মারিনি। ছেলেবেলা থেকেই রক্তপাত জিনিসটাকে আমি সহ্য করতে পারি না।'

'আমিও তাই, শঙ্কু,' বলল সন্ডার্স, 'কিন্তু নিরীহ মানুষের উপর যারা অমানুষিক অত্যাচার করে, তাদের উপর গুলি চালাতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করব না। বাইব্‌লে যে বলে : এক গালে চড় খেলে অন্য গাল এগিয়ে দাও—এতে আমি মোটেই বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু এসব কথা তুমি আমায় বলছ কেন ?'

সন্ডার্স কোনও জবাব না দিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলভার বার করল।—'এটা জার্মানিতে তৈরি। এর নাম লুগার অটোম্যাটিক। এতে আমি ছ'টা গুলি ভরেছি। তুমি এটা সঙ্গে নেবে। একটু দেখে নাও। এই হল সেফ্‌টি ক্যাচ। এটা এইভাবে টিপলে আলগা হয়, আর তখনই গুলি চালানো সম্ভব। গুলতিতে টিপ ভাল হলে রিভলভারেও হবে, এটা আশা করা ঠিক না। সত্যি বলতে কী, রিভলভারের চেয়ে রাইফ্‌লের সাহায্যে লক্ষ্যভেদ করা অনেক সহজ। কিন্তু কেউ যদি তোমার কাছে—অর্থাৎ পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে—দাঁড়ায়, তা হলে তার দিকে তাগ করে রিভলভার চালালে তাকে কিছুটা ঘায়েল করবে নিশ্চয়ই। অতএব—হাত বাড়াও।'

অগত্যা রিভলভারটা নিয়ে নিলাম। আমি রোগাপটকা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি মানুষ হলেও—শরীরে আমার শক্তির অভাব ছিল না। এর কারণ আমার বাবা। পুষ্টিকর খাবার খাওয়া আর নিয়মিত ব্যায়াম করা—এই দুটোর জন্যই দায়ী ছিলেন বাবা।

আজকাল বড় বড় জেট প্লেন ওড়ে পৃথিবী থেকে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উপরে। ফলে জানালা দিয়ে নীচের দিকে চাইলে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। যে প্লেনে নরবার্টের সঙ্গে বার্লিন যাচ্ছিলাম, তাতে চারটে প্রপেলার রয়েছে, আর সেটা অনেক নীচ দিয়ে ওড়ার ফলে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট খেতখামার সবই দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম। ভারী মনোরম, পরিচ্ছন্ন এই দৃশ্য। শীতকাল বলে সবুজের একটু অভাব, এক এক জায়গায় দেখছি বরফও জমে রয়েছে।

বিকেলে যথাসময়ে আমরা বার্লিন এয়ারপোর্টে এসে নামলাম। তখন অবিশ্যি এয়ারপোর্ট কথাটা চালু হয়নি ; বলা হত এয়ারোড্রোম। আজকের তুলনায় অনেক ছোট, তবে আজকের মতোই নানান নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে চলতে হয়।

একটা কাউন্টারের পিছনে হৃষ্টপুষ্ট এক জার্মান বসে যাত্রীদের পাস্‌পোর্ট চেক করছে। নরবার্ট আর আমি লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। দশ মিনিটের মধ্যে কাউন্টারের সামনে পৌঁছে গেলাম। নরবার্ট আমার পিছনে, কাজেই আমাকেই আগে পাস্‌পোর্টটা দিতে হল। সেই সঙ্গে একটা হলদে কার্ডও দেবার ছিল, যাতে কতগুলো নির্দিষ্ট জায়গায় নামধাম, কোন দেশের লোক, বার্লিনে ক' দিন থাকব, কোথায় থাকব, কেন এসেছি, সব লিখতে হয়েছিল প্লেনে বসেই।

ইনস্পেক্টর কার্ডটায় চোখ বুলোতে বুলোতে একবার চশমার উপর দিয়ে আমার দিকে দেখলেন ; তারপর মৃদুস্বরে বার তিনেক 'শাঙ্কু' বলে প্রশ্ন করার সুরে বললেন, 'আর্টস্ট ?' অর্থাৎ আমি ডাক্তার কিনা প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমি বললাম, 'নাইন। ভিজেনশাফ্‌টলের। প্রোফেসর।' অর্থাৎ, 'না, আমি বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক।'

লোকটা এবার পাস্‌পোর্টটা ভাল করে দেখল। তারপর তার পিছনে দাঁড়ানো একজন ইউনিফর্মধারী পুলিশের দিকে ফিরে বলল, 'ফ্রিৎস, আনেরকেনেন সী ডাস হের ?' অর্থাৎ, তুমি এই ভদ্রলোককে চিনতে পারছ ?

উত্তর এল, 'নাইন, নাইন।'—না, না।

'এখানে ক'দিন থাকবে ? আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ইনস্পেক্টর। বললাম, 'দিন তিনেক।'

'আসার উদ্দেশ্য ?'

'ভ্রমণ। কার্ডেই লেখা আছে।'

'ঠিক আছে। এগিয়ে যাও।'

যাক। একটা বাধা অতিক্রম করা গেছে। ভদ্রলোক যে কাগজে আমার ছবি দেখেছেন, এবং আমার চেহারার সঙ্গে ছবির সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন তাতে সন্দেহ নেই।

আমাদের মাল সংগ্রহ করে যখন বেরোচ্ছি, তখন এটা লক্ষ করলাম যে কিছু লোক আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। এর ফলে যে কিছুটা অস্বস্তি ভোগ করছিলাম সেটা অস্বীকার করব না।

ট্যাক্সিতে উঠে নরবার্ট ড্রাইভারকে গন্তব্যস্থল বাতলে দিল—সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসে।

বার্লিন যে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর সেটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না। এও বুঝলাম যে শহরটা ঘড়ির কলের মতো চলে ; এর চরিত্রের সঙ্গে লন্ডনের কোনও মিল নেই।

www.BDeBooks.Com

লন্ডনের রাস্তাঘাটে যে সংখ্যায় ভারতীয় দেখা যায়, এখানে ততটা দেখা যায় না, যদিও জানি যে বেশ কিছু ভারতীয় এখানে হয় পড়াশুনো করছে না হয় চাকরি করছে।

আধ ঘণ্টাখানেক চলার পর নরবার্ট ট্যাক্সিওয়ালাকে ডাইনে থামাতে বলল। ট্যাক্সি একটা দোতলা বাড়ির সামনে থামল।

নরবার্ট ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাঁ হাতে নিজের সুটকেস আর ডান হাতে আমারটা নিয়ে সদর দরজায় গিয়ে বেল টিপল। অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা চাকর এসে দরজা খুলতে নরবার্ট তার হাতে ব্যাগগুলো চালান দিয়ে আমাকে সঙ্গে করে সিঁড়ি দিয়ে পা চালিয়ে দোতলায় উঠে গেল।

'আগে বাবাকে দেখবে তো ?'

'এক্ষুনি, এক্ষুনি।'

একটা বইয়ে ঠাসা ঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম, সেটা শোবার ঘর। একপাশে একটা খাটে লেপের তলায় একজন প্রৌঢ় শুয়ে আছেন আধবোজা চোখে। তাঁর হাঁ করা মুখ দিয়ে দমকে দমকে নিশ্বাস বেরোচ্ছে। ভদ্রলোকের পাতলা হয়ে আসা কালো চুলের সঙ্গে অল্প পাকা চুল মিশেছে, আন্দাজে মনে হয় বছর পঞ্চান্ন বয়স। তাঁর মাথায় আর ডান কনুইয়ে ব্যান্ডেজ যে অপটু হাতের কাজ, সেটা দেখলেই বোঝা যায়। ইনিই যে হাইনরিখ স্টাইনার সেটা আর বলে দিতে হয় না।

খাটের পাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছছে একটি ষোলো-সতেরো বছর বয়সের মেয়ে। নরবার্ট তাকে দেখিয়ে বলল, 'আমার বোন লেনি।'

আমি এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের নাড়ী দেখলাম। স্পন্দন প্রায় নেই বললেই চলে। আমার বাবার মৃত্যুর সময় আমি পাশেই ছিলাম। তাঁর মুখে যে মৃত্যুর ছায়া দেখেছিলাম, এখানেও তাই দেখছি।

আর দেরি করা চলে না।

আমি জানতাম এই অবস্থায় বড়ি গেলানো চলবে না, তাই একটা কাগজের মোড়কে দুটো বড়ি গুঁড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। লেনিকে বললাম, 'তোমার পাশেই টেবিলে ফ্লাস্ক আর গেলাস দেখছি ; আমাকে এক গেলাস জল দাও।'

লেনি যখন জল ঢালছে, তখন একটা শব্দ শুনে আমার দৃষ্টি প্রোফেসর স্টাইনারের দিকে চলে গেল। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে। একটা শব্দ বেরোল—'আ-হা'। আমি নরবার্টের দিকে চাইলাম।

'আমার মা-র নাম ছিল হানা।'

প্রোফেসরের মুখ এখনও হাঁ। আমি মোড়ক খুলে জলের গেলাস হাতে নিয়ে রুগির পাশে গিয়ে তাঁর হাঁ করা মুখের ভিতর জল আর পাউডার ঢেলে দিলাম।

'আর কিছু করতে হবে কি ?' নরবার্ট প্রশ্ন করল। বললাম, 'হ্যাঁ, আমি একটু কফি খাব—ব্ল্যাক কফি।'

লেনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘড়িতে বার্লিনের টাইম করে নিয়েছিলাম, দেখলাম পৌনে ছটা। জানলা দিয়ে দেখছি রাস্তার আলো জ্বলে গেছে, আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে। এটা জানি যে, কাল সকালের আগে ওষুধের ফলাফল জানা যাবে না, তাই কফি খেয়ে নরবার্টকে বললাম, 'বার্লিনের একটা বিখ্যাত রাস্তার নাম আমি শুনেছি—কুরফ্যুরস্টেনডাম। সেটা একবার দেখে আসা যায় কি ?'

'হাঁটতে রাজি আছ ?'

'নিশ্চয়ই। দেশে আমি সকালে রোজ চার মাইল করে হাঁটি।'

'অবিশ্যি ক্লান্ত লাগলে সব সময়ই ট্যাক্সি নেওয়া যায়।'

আশ্চর্য !—পুলিশশাসিত দেশ, কর্ণধার হলেন দুর্নীতির পরাকাষ্ঠা, অথচ বাইরে থেকে রাজধানীর চেহারা দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই। পুলিশ চোখে পড়ে ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে রয়েছে নিরুদ্বিগ্ন জনস্রোত, ঝলমলে দোকানপাট, সিনেমা থিয়েটারের বাইরে সুসজ্জিত নারী পুরুষের ভিড়। নরবার্টকে কথাটা বলাতে ও বলল, 'সেই জন্যেই তো যারা অল্পদিনের জন্য এখানে আসে, তারা বাইরে থেকে হিটলারের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে যা শুনেছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করে।'

কুরফ্যুরস্টেনডামের একটা পোশাকের দোকানে কোট প্যান্ট শার্ট পুলোভার দেখছি, এমন সময় আমার ডান হাতের কনুইয়ে একটা মৃদু চাপ অনুভব করলাম। ঘুরে দেখি, একজন মাঝবয়সি মহিলা আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

'প্রোফেসর শাঙ্কু ?' ইতস্তত ভাব করে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা। আমি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলাতে দ্বিতীয় প্রশ্ন এল, 'কোয়নেন সী ডয়েচ ?' অর্থাৎ, তুমি জার্মান বলো ?

এ প্রশ্নের উত্তরেও হ্যাঁ বলাতে ভদ্রমহিলার মুখ প্রথমে আনন্দে উদ্ভাসিত, আর পরমুহূর্তে

www.BDeBooks.Com

বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমার হাতদুটো ধরে কাতরকণ্ঠে মহিলা বললেন, 'হেলফেন মিখ, বিটে, হেলফেন মিখ, হের প্রোফেসর!' অর্থাৎ, দোহাই প্রোফেসর, আমাকে সাহায্য করো। তাঁর কী হয়েছে জিজ্ঞেস করাতে ভদ্রমহিলা বললেন ত্রিশ বছর থেকে তাঁর "কাটার" বা সর্দির ধাত, আর সেই সঙ্গে মাথার যন্ত্রণা। 'তুমি তো জানো সর্দির ওষুধ আজ পর্যন্ত কেউ বার করতে পারেনি। তোমার "আলহাইলমিটেল" বড়ি মিরাকুরল একটা দাও আমাকে দয়া করে!"

'আলহাইলমিটেল' হল সর্বরোগনাশক। এখনও যে ভদ্রমহিলার নাক বন্ধ হয়ে রয়েছে সেটা তাঁর কথা শুনেই বুঝতে পারছিলাম।

'তোমার নাম কী?' নরবার্ট জিজ্ঞেস করল।

'ফ্রয়লাইন ফিৎস্‌নার',—অর্থাৎ মিসেস ফিৎস্‌নার।

আমি বললাম, 'আমি দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্তে। আমি যে তোমাকে ওষুধ দিয়েছি সেটা কাউকে বলবে না।'

ভদ্রমহিলা ঘন ঘন মাথা নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি কাউকে বলবেন না।

আমার পকেটে চারটে বড়ি ছিল, তার দুটো প্রোফেসর স্টাইনারকে দিয়েছি, বাকি দুটো মহিলাকে দিয়ে দিলাম।

'তোমার কাছে কাগজ পেনসিল আছে?' নরবার্ট প্রশ্ন করল।

'ইয়া, ইয়া,' বলে ভদ্রমহিলা তাঁর হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট নোটবুক আর পেনসিল

বার করলেন। নরবার্ট তাতে তার বাড়ির ফোন নম্বরটা লিখে দিয়ে বলল, 'কাল যে কোনও একটা সময় ফোন করে প্রোফেসরকে জানাবে তুমি কেমন আছো।'

ভদ্রমহিলা 'ডাঙ্কেশোয়ন, ডাঙ্কেশোয়ন' বলে ধন্যবাদ দিতে দিতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

আমরা কুরফ্যুরস্টেনডামেরই একটা রেস্টোরান্টে ডিনার সেরে নিলাম।

ন'টায় বাড়ি ফিরে প্রোফেসর স্টাইনারের ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি ঘুমোচ্ছেন। লেনিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার বাবা কি এর মধ্যে কোনও কথা বলেছেন ?'

লেনি বলল, 'আরেকবার মা-র নাম করেছিলেন। আর বললেন—আমি আসছি।'

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার ঘরে চলে এলাম। হে প্রভু—মিরাকিউরল যেন ব্যর্থ না হয়।

খাটের পাশে একটা টেবিলের উপর চকোলেট আর একটা ছোট্ট কার্ডে মেয়েলি হাতে লেখা 'গুটে নাট্‌ট'—অর্থাৎ গুড নাইট—দেখে বুঝলাম মায়ের অভাবে লেনি এই বয়সেই পাকা গৃহিণী হয়ে উঠেছে।

দিনে ধকল গেছে বলে রাত্রে ঘুমটা ভালই হল। গিরিডিতে উঠি পাঁচটায়, এখানে ঘুম ভাঙতে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি ছ'টা বাজতে পাঁচ। আসলে পালকের বালিশে শুয়ে আরামটা হয়েছে একটু বেশি।

আমি চটপট লেপের তলা থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা দিতেই কণ্ঠস্বর কানে এল—উদাত্ত, সুরেলা কণ্ঠ। কিন্তু এ কী ! এ যে সংস্কৃত, আর কথাগুলো আমার চেনা !—

'বেদাহমেতং পুরুষংমহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ...'— আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে চিনিয়াছি...এ যে উপনিষদের কথা ! ছেলেবেলায় বাবাকে আবৃত্তি করতে শুনেছি, আর আজও মনে আছে।

আমি গায়ে একটা কোট চাপিয়ে নিয়ে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

গলা আসছে প্রোফেসরের ঘরের দিক থেকে।

'ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য পন্থা বিদ্যতে হয়নায়।'

সাধক কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করেন...তদ্ভিন্ন মুক্তিপ্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।...

প্রোফেসরের ঘর খালি। ওই যে ওদিকে দরজা। তার ওদিকে ব্যালকনি !

রুদ্ধশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে দেখি, প্রোফেসর স্টাইনার ব্যালকনির অপর প্রান্তে আমার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ভোরের আকাশের দিকে চেয়ে উপনিষদ আবৃত্তি করছেন।

হয়তো আমার পায়ের আওয়াজ পেয়েই মাঝপথে থেমে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে যেন একটু অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'কস্তম্ ?' অর্থাৎ সংস্কৃতে 'তুমি কে ?'

আমি জার্মানেই উত্তর দিলাম।

'আমার নাম ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।'

'ত্রিলোকেশ্বর ? বিষ্ণু, শিব না সূর্য ?'

আমি জানতাম আমার নাম তিনটেকেই বোঝায়। আমি মৃদু হেসে বললাম, 'কোনওটাই না। আমি ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করি। আমি একটা আশ্চর্য আয়ুর্বেদিক ওষুধ পেয়েছি, যেটা সবরকম ব্যারামেই কাজ করে। লন্ডনে—'

www.BDeBooks.Com

'মিরাকুরল ?' ভদ্রলোক আমাকে বাধা দিয়ে বললেন। 'আমি তোমার ওষুধে ভাল হয়ে উঠেছি ? আমি তাই ভাবছিলাম—এই চার বছর তো দুর্যোগ ছাড়া আর কিছু জোটেনি আমার কপালে, হঠাৎ ঈশ্বর আমার উপর এত সদয় হলেন কেন ?... কিন্তু, ত্রিলোকেশ্বর—আমি তো মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলাম ; কারণ, বেঁচে থেকে তো আমার কোনও লাভ নেই !'

'লাভ আছে, প্রোফেসর স্টাইনার। কাল আপনার ছেলে বলছিল, আপনি ভাল হয়ে উঠলে আপনাকে জার্মানি থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার উপায় সে নিশ্চয়ই বার করবে। তাতে যদি প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয় তাতেও ক্ষতি নেই। শঠে শাঠ্যম্ কথাটা তো আপনি জানেন। এই রাজ্যে এই অন্ধকার যুগে নীতির কথা ভাবলে চলবে না। আপনি বাইরে কোথাও চলে গিয়ে আপনার কাজ আবার শুরু করুন।'

সৌম্যদর্শন পণ্ডিত যেন আপন মনেই বলে উঠলেন, 'প্যারিস !... আঁদ্রে... আঁদ্রে ভের্সোয়া... আমার বন্ধু... সেও ভারততাত্ত্বিক... কতবার বলেছে এখানে চলে এসো, এখানে চলে এসো...'

'বেশ তো, তাই যাবেন আপনি !'

স্টাইনার উদাস দৃষ্টিতে সবে ওঠা সূর্যের দিকে চেয়ে বললেন, 'কত কাজ বাকি ! কত কাজ বাকি ! এরা কিছুই করতে দেয়নি আমাকে। ভাগ্যের কী পরিহাস ! নাৎসি পার্টি—যাদের

নাম উচ্চারণ করতে মন বিষিয়ে ওঠে—তারা স্বস্তিককে করেছে তাদের প্রতীক, সিম্বল, এমব্লেম ! সু—অর্থাৎ ভাল, অস্তি—অর্থাৎ আছে ; এই হল স্বস্তি, আর তার থেকে স্বস্তিক। এরা বলে স্‌ভাসটিকা ! এর চেয়ে—'

প্রোফেসরকে কথা থামাতে হল। আর সেইসঙ্গে আমিও তটস্থ।

বাড়ির সদর দরজায় ধাক্কা পড়েছে সজোরে। একবার নয়, তিনবার।

'আবার তারা !' গভীর উৎকণ্ঠার সুরে বললেন স্টাইনার।

বাইরে একটা পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে নরবার্ট আর লেনি ব্যালকনিতে ছুটে এল।

বাবাকে সুস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে দু'জনেরই মুখ হাঁ হয়ে গেল। পরমুহূর্তে বিস্ময় কাটিয়ে উঠে নরবার্ট তার বাবাকে হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বিছানাতে শুয়ে পড়ো—এক্ষুনি। মুমূর্ষুর অভিনয় করতে হবে। গেস্টাপো আবার এসেছে।'

এর মধ্যে আরও তিনবার দরজায় ধাক্কা পড়েছে। স্টাইনার বিছানায় শোয়া মাত্র লেনি একটানে লেপটা তাঁর উপরে টেনে তাঁর চোখ বুজিয়ে মুখ হাঁ করিয়ে দিল।

'কয়খেন সী, পাপা !' অর্থাৎ হাঁপ ধরার মতো করে নিশ্বাস নাও, বাবা।

নরবার্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আমি তার পিছনে।

দরজায় আবার তিনগুণ জোরে ধাক্কা পড়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা খুলতে সশস্ত্র পুলিশ ভিতরে ঢুকে এল। পরমুহূর্তে নরবার্টের দিক থেকে তার দৃষ্টি আমার দিকে ঘুরে এল। তারপর ডান হাত প্রসারিত করে উপরদিকে তুলে বলল, 'হাইল হিটলার !'

আমাকে নির্বাক দেখে পুলিশের গলা সপ্তমে চড়ে গেল।

'হাইল হিটলার !'

সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

অর্ধেক কেন, আমি গোটা আত্মসম্মান ত্যাগ করে ঝামেলা বাঁচানোর জন্য ডান হাত তুলে দিব্যি বাজখাঁই গলায় বললাম, 'হাইল হিটলার'। প্রোফেসর স্টাইনারই যখন অভিনয় করছেন, তখন আমারই বা করতে আপত্তি কী ?

পরে জেনেছিলাম ইনি গেস্টাপো নন। গেস্টাপোর কোনও ইউনিফর্ম নেই। ইনি হলেন গেস্টাপোর মাসতুতো ভাই 'ব্ল্যাক্‌শার্ট'।

এবার হাত নামিয়ে ব্ল্যাক্‌শার্ট বললেন—আমার সঙ্গে চলো, জল্‌দি।—'কম মিট মীর—শ্নেল্ !'

লোকটা বলে কী ? জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ?'

'সে পরে জানতে পারবে। ভদ্র পোশাক পরে নাও, আর সঙ্গে তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে নাও।'

বুঝতে পারলাম আমি নিরুপায়, এদের আদেশ মানতেই হবে। বললাম, 'পাঁচ মিনিট সময় দাও। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

পোশাক বদলে সুটকেসটার দিকে দৃষ্টি দিতে মনে হল, সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা তাতে রয়েছে। জানি এরা আমাকে সার্চ করতে পারে, তাও পিস্তলটা প্যান্টের পকেটে নিয়ে নিলাম।

ঘর থেকে যখন বেরোব, তখন নরবার্ট এসে হাজির—তার মুখ ফ্যাকাশে, চোখের কোলে জল চিকচিক করছে।

'আমায় ক্ষমা করো, প্রোফেসর !'

www.BDeBooks.Com

আমি নরবার্টের পিঠে দুটো চাপড় মেরে বললাম, 'ছেলেমানুষি কোরো না। আমার মনে হয় না এখন এরা তোমার বাবার উপর আর অত্যাচার করবে। এইবেলা ভেবে স্থির করো তোমরা কী করে পালাবে। আমার সম্বন্ধে একদম ভেবো না। আমার মন মিথ্যে বলে না, এটা আমি আগেও দেখেছি। মন বলছে আমার মৃত্যুর সময় এখনও আসেনি। কাজেই তোমার কর্তব্য তুমি করে যাও। এ দেশে তোমাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তোমার বাবা প্যারিস যেতে চান। তুমি তার ব্যবস্থা করো। মনে রেখো, এ অবস্থায় জাল, জুয়াচুরি, মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া—কোনওটাই অন্যায় নয়।'

নরবার্ট রুমাল দিয়ে চোখ মুছে বলল, 'একটা কথা...'

'কী ?'

'মিসেস ফিৎস্‌নার এক্ষুনি ফোন করেছিলেন। তাঁর সর্দি সেরে গেছে।'

'গুড।'

নরবার্ট ও লেনিকে গুডবাই করে পুলিশের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরে এসে দেখি বাড়ির সামনে এক বিশাল কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। এমন গাড়ি আমি এর আগে দেখিনি,

তাই নামটা জিজ্ঞেস না করে পারলাম না। উত্তর এল, 'ডাইমলার'।

গাড়ির দরজা খুলে আমাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে আমার পাশেই বসলেন পুলিশ। গাড়ি রওনা দিল। আর একটিমাত্র প্রশ্ন করেছিলাম, আর তার জবাবও পেয়েছিলাম।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা জানতে পারি কি ?'

'কারিনহল।'

এটা বুঝতে পারছিলাম যে, আমরা উত্তর দিকে চলেছি। প্রশস্ত, আরামদায়ক গাড়ি, মসৃণ রাস্তা, গাড়ি যে চলেছে তা প্রায় টেরই পাওয়া যায় না। মিনিট পনেরো চলার পরেই তন্দ্রা এসে গেল।

যখন আবার সজাগ হলাম তখন দেখলাম বাইরের দৃশ্য একেবারে বদলে গেছে। আমরা শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে এসেছি। গাছপালা খেতখামার, কৃষকদের ছোট ছোট কটেজ বাড়ি মিলিয়ে মনোরম দৃশ্য, যার সঙ্গে আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের দৃশ্যের কোনও সাদৃশ্য নেই।

এতক্ষণ কথা না বলে অস্বস্তি লাগছিল, তাই আমার পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোককে আরেকটা প্রশ্ন করলাম।

'আমার নাম তো তুমি নিশ্চয় জানো ; তোমারটা কী জানতে পারি ?'

উত্তরে এল, 'এরিখ ফ্রোম।'

এবারে বাইরের দৃশ্য বদলে গেল। এখানে গাছপালা অনেক বেশি, খোলা প্রান্তরের বদলে দু' পাশে ফলের বাগান, যদিও শীতকাল বলে গাছের পাতা সব ঝরে গেছে।

এবারে বাঁয়ে একটা দীর্ঘ পাঁচিল পড়ল। কিছুদূর গিয়েই পাঁচিলের গায়ে একটা প্রকাণ্ড ফটকের মধ্যে দিয়ে আমাদের গাড়িটা ঢুকে গেল।

প্রায় আধ মিনিট ধরে আমরা এগিয়ে চললাম প্রশস্ত নুড়ি ঢালা পথ দিয়ে। এ কোথায় এলাম ? কোনও বাসস্থানের চিহ্ন তো দেখতে পাচ্ছি না এখনও পর্যন্ত ?

এবার একটা মোড় ঘুরেই আমাদের গন্তব্যস্থল চোখে পড়ল। এটা যে একটা প্রাসাদ তাতে সন্দেহ নেই, তবে প্রাচীন নয়। অথবা প্রাচীন হলেও, সম্প্রতি যে অনেক সংস্কার হয়েছে সেটা বোঝা যায়। একটা বিস্তীর্ণ বাগান—তাতে ফুলের কেয়ারি, লিলিপুল, শ্বেতপাথরের মূর্তি, সবই আছে—সেই বাগানের তিন দিক ঘিরে প্রাসাদ। তারই একটার বিশাল সদর দরজার সামনে আমাদের গাড়িটা থামল। আমরা দু'জন গাড়ি থেকে নেমে প্রহরীকে পেরিয়ে সেই দরজা দিয়ে প্রাসাদের ভিতরে ঢুকলাম।

প্রথমেই পড়ল একটা ঘর, যেটা লম্বায় অন্তত পঞ্চাশ গজ তো হবেই। ঐশ্বর্যের এমন জলজ্যান্ত নমুনা আমি আর দেখিনি। মাথার উপর বিশাল বিশাল ঝাড়লণ্ঠন, দেয়ালে গিল্টি করা ফ্রেমে বাঁধানো জগদ্বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা তেলরঙের ছবি, ঘরের এ প্রান্তে দোতলায় যাবার জন্য প্রশস্ত ঘোরানো সিঁড়ি।

এই ঘর পেরিয়ে আমরা আরেকটা ঘরে পৌঁছোলাম, যেটাকে বলা যেতে পারে রিসেপশন রুম। এখানে বসার জন্য বড় বড় সোফা, কাউচ, বাহারের চেয়ার ছাড়া একপাশে একটা প্রকাণ্ড টেবিল, যার উপর রয়েছে কাগজপত্র, টেলিফোন, ফুলদানি, জলের ফ্লাস্ক ইত্যাদি।

এরিখ একটা সোফার দিকে নির্দেশ করে নিজে এক কোণে একটা সুদৃশ্য চেয়ারে বসল।

পুরু পারস্য দেশীয় কার্পেটের উপর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে সোফায় বসে নরম গদিতে প্রায় চার ইঞ্চি ডুবে গেলাম। এখনও জানি না কী কারণে আমাকে এখানে আনা হয়েছে। তবে এটা দেখেছি যে, একটি ভৃত্যস্থানীয় লোক আমাকে প্রাসাদে ঢুকতে দেখেই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেছে।

www.BDeBooks.Com

মিনিট পাঁচেক বসার পর প্রাসাদের চতুর্দিক থেকে নানান ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে, এমন সময় এরিখ হঠাৎ তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাত তুলে 'হাইল হিটলার' বলল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করলেন ছাই রঙের ডাব্‌ল-ব্রেস্টেড সুট পরা বিশালবপু এক ব্যক্তি।

তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে 'স্প্রেখেন সী ডয়েচ ?' প্রশ্ন করতেই আমি বুঝলাম এঁর ছবি আমি দেখেছি। আমি 'হ্যাঁ' বলতে ভদ্রলোক আরও দু' পা এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন।

'কেনেন সী মীর ?'

অর্থাৎ তুমি আমাকে চেন ?

আমি বললাম, 'ভারতবর্ষে যারা খবরের কাগজ পড়ে, তাদের অধিকাংশই তোমার চেহারার সঙ্গে পরিচিত, হের্ গোয়রিং।'

'হিটলারের পরেই আমার স্থান', পায়চারি শুরু করে বললেন গোয়রিং। 'জার্মানির সামরিক শক্তির প্রধান কারণ আমি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে জার্মানির তুল্য শক্তিশালী দেশ আর নেই।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তুমি এখন কোথায় এসেছ, জান ?' পায়চারি থামিয়ে আমার দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন গোয়রিং।

আমি বললাম, 'কারিনহল।'

'কারিনহল কী জান ?'

'মনে হচ্ছে তোমার বাসস্থান।'

'কারিন ছিল আমার প্রথম স্ত্রীর নাম। কারিন ফন কাট্‌সফ্। ১৯৩১-এ তার মৃত্যু হয়। কারিনহল আগে ছিল একটা হান্টিং লজ। এটাকে আমি কিনে নিয়ে একটি প্রাসাদে পরিণত করি। এটা একাধারে কারিনের স্মৃতিসৌধ এবং আমার কান্ট্রি হাউস। অদূর ভবিষ্যতে কারিনহল হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌধের মধ্যে একটি।'

আপাতত কথা শেষ। কিন্তু এটা বুঝতে পারছি যে, গোয়রিং একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে।

এবার যে প্রশ্নটার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম, সেটা গোয়রিং-এর গম্ভীর গলায় উচ্চারিত হল।

'সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসের ওই বর্বর ইহুদি স্টাইনারের বাড়িতে তুমি কী করছিলে ?'

আমায় কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হল। সত্যি বলব, না বানিয়ে বলব ? তারপর মনে হল, বানিয়ে বলে হয়তো এখনকার মতো রেহাই পেতে পারি, কিন্তু আসলে কী ঘটেছে সেটা বার করতে এদের দুর্ধর্ষ গুপ্ত পুলিশের সময় লাগবে না। তাই যতটা পারি সাহস সঞ্চয় করে বললাম, 'পুলিশি অত্যাচারে প্রোফেসর স্টাইনারের প্রাণ সংশয় হওয়াতে আমাকে লন্ডন থেকে নিয়ে আসা হয় ওঁর চিকিৎসার জন্য।'

'মিরাকুরলে কাজ দিয়েছে ?'

'দিয়েছে।'

গোয়রিং-এর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল।

'যে জাতকে আমরা নির্বংশ করতে চলেছি, তারই একজনকে তুমি অনুকম্পা দেখাচ্ছ ? ইহুদিরা কী জান ?'

আমি কিছু বলার আগেই গোয়রিং ইহুদিদের সম্পর্কে পাঁচটা বিশেষণ প্রয়োগ

করল—গ্রাউসাম, নীডের, গাইৎসিগ, লিস্টিগ, বেডেনকেনলস। অর্থাৎ—অসভ্য, হীন, লোভী, ধূর্ত, বিবেকহীন।

লোকটার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা ক্রমেই বাড়ছিল। এই শেষ কথাগুলোতে হঠাৎ আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি বললাম, 'আমি জাত মানি না। আমি বিজ্ঞানী। একজন ইহুদি বৈজ্ঞানিক আমার আরাধ্য দেবতা। তাঁর নাম অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।'

চোখের সামনে গোয়রিং-এর মুখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে গেল।

'তুমি কি ভাবছ স্টাইনার রেহাই পাবে ?'

'ভাবছি না, আশা করছি।'

'তোমার আশা আমি পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দিলাম। স্টাইনারের মেয়াদ শুধু আজকের দিনটা। একটি ইহুদিকেও আমরা পার পেতে দেব না। তারাই আমাদের দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছিল। আগাছার মতো তাদের একেকটাকে ধরে ধরে উপড়ে ফেলতে হবে।'

ইহুদিদের বিরুদ্ধে এ জাতীয় বিদ্বেষ-বর্ষণ শুনতে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি একটু কড়া সুরেই বললাম, 'হের্ গোয়রিং, আমাকে এখানে আনার উদ্দেশ্যটা কী, সেটা জানতে পারি ?'

গোয়রিং যেন কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'বিনা কারণে আনিনি। একটা উদ্দেশ্য ছিল একজন ভারতীয়কে আমার এই কান্ট্রি হাউসটা দেখানো—এর আগে কোনও ভারতীয় দেখেনি—কিন্তু আসল উদ্দেশ্য সেটা নয়।'

'তা হলে ?'

গোয়রিং আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলল—

'আমাকে দেখে আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা হয় ?'

'তোমার মতো মোটা লোককে স্বাস্থ্যবান বলা চলে না নিশ্চয়ই, আর তোমার মতো ঘামতে আমি আর কাউকে দেখিনি। এই দশ মিনিটের মধ্যে পাঁচবার তুমি রুমাল বার করে মুখ মুছেছ। অবিশ্যি আমি তো ডাক্তার নই, কাজেই তোমার ব্যারামটা কী, তা আমি আন্দাজ করতে পারছি না।'

গোয়রিং হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলা সপ্তমে চড়িয়ে বলল, 'তুমি কি জান যে, এই ঘামের জন্য আমাকে দিনে আটবার শার্ট বদল করতে হয় ? তুমি কি জান যে, আমার ওজন একশো সত্তর কিলো ? ড্র্যাসে কাকে বলে জান ?'

'জানি।'

ড্র্যাসে হচ্ছে ইংরেজিতে যাকে বলে গ্ল্যান্ড, বাংলায় গ্রন্থি।

'এই ড্র্যাসেই হল যত নষ্টের গোড়া,' বলল গোয়রিং। 'সেটা আমার ডাক্তার জানে। কিন্তু নানারকম চিকিৎসাতেও কোনও ফল দেয়নি। অথচ আমি যে শারীরিক পরিশ্রম করি না, তা নয় ; আমি হাঁটি, আমি টেনিস খেলি—যদিও যার সঙ্গে খেলি তাকে বলে দিতে হয় যে, বল যেন আমার হাতের নাগালে পড়ে, কারণ আমি দৌড়োতে পারি না। এ ছাড়া আমি নিয়মিত শিকার করি। অথচ—'

'খাওয়া ? অতিরিক্ত আহার কিন্তু মোটা হবার একটা বড় কারণ।'

গোয়রিং একটুক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'খেতে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। দিনে চারবার খাওয়ায় আমার হয় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্যান্ডউইচ, সসেজ, বিয়ার আনিয়ে খেতে হয়। কিন্তু আমি তো আরও অনেক খাইয়েকে জানি ; তারা তো আমার মতো মোটা নয়, আর আমার মতো অনবরত ঘামে না। এই অতিরিক্ত চর্বির জন্য কাজের কী অসুবিধা হয়, তা তুমি জান ?'

www.BDeBooks.Com

আমি কোনও মন্তব্য করলাম না দেখে গোয়রিং আবার মুখ খুলল।

'তোমার ওষুধে কী কী অসুখ সারিয়েছ ?'

'ক্যানসার, যক্ষ্মা, উদরি, হাঁপানি, ডায়াবেটিস...'

'তা যদি হয়, তা হলে তোমার ওষুধে আমার গ্ল্যান্ডের গোলমাল নিশ্চয়ই সারবে। কটা বড়ি খেতে হয় রুগিকে ?'

'সাধারণত দুটো, এবং একবারই খেতে হয়।'

'ক' দিনে ফল পাওয়া যায় ?'

'আমার অভিজ্ঞতায় চব্বিশ ঘণ্টার বেশি লাগে না।'

'ওষুধ আছে তোমার সঙ্গে ?'

'আমার সব কিছুই তো সঙ্গে নিয়ে আসতে বলা হয়েছিল।'

'তা হলে দুটো আমাকে দাও। আমি এখনই খাব।'

'ওষুধ আমি দেব, হের্ গোয়রিং—কিন্তু একটা শর্তে।'

'কী ?'

'কাল প্রোফেসর স্টাইনার তাঁর ছেলে মেয়েকে নিয়ে প্যারিস যাবেন। তুমি যথাস্থানে আদেশ দাও যে, তাঁদের যেন কেউ বাধা না দেয়।'

এবার গোয়রিং-এর মুখ শুধু লাল হল না, সেই সঙ্গে তার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরল। তারপর রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে সে ঘর কাঁপিয়ে বলে উঠল, 'দু'শো বছর ধরে যে জাত পরাধীন হয়ে আছে, তাদেরই একজনের এত বড় আস্পর্ধা!—এরিখ, আমি এই ব্যক্তিকে এবং এর ব্যাগ সার্চ করতে চাই ; তুমি এর দিকে রিভলভার তাগ করে থাকো।'

এরিখের অস্তিত্ব প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার সে দ্রুতপদে এগিয়ে এসে কোমরের খাপ থেকে রিভলভার বার করে আমার দিকে উঁচিয়ে দাঁড়াল। এবার গোয়রিং আমার দিকে এগিয়ে আসতে আমি হাত তুললাম।

'হাল্ট, হের্ গোয়রিং!'

গোয়রিং থতমত খেয়ে বলল, 'মানে ?'

আমি মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম, এ অবস্থায় যা বললে কাজ হবে, সেটাই বলব।

'এ ওষুধ স্বপ্নে পাওয়া ওষুধ, হের্ গোয়রিং,' অকম্পিত কণ্ঠে বললাম আমি। 'যে গাছ থেকে এ ওষুধ তৈরি হয় সেটা কোথায় পাওয়া যায়, তা আমি স্বপ্নে জেনেছি। এও জেনেছি যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ ওষুধ প্রয়োগ করলে এতে ফল তো হয়ই না, বরং অনিষ্ট হতে পারে। তুমি কি চাও যে তোমাকে আটের জায়গায় বারো বার করে শার্ট বদল করতে হয় ? তুমি কি চাও যে, তোমার ওজন একশো সত্তরের জায়গায় দুশো কিলো হয় ? কাজেই রিভলভার দেখিয়ে কোনও ফল হবে না, হের্ গোয়রিং। তুমি এরিখকে যেতে বলো। তারপর আমি বাক্স থেকে ওষুধের শিশি বার করব, তারপর তুমি ফোন করে স্টাইনারের পথে বাধা অপসারণ করবে, তারপর আমি তোমাকে ওষুধ দেব।'

আমার কথাগুলো গোয়রিং-এর মগজে ঢুকতে খানিকটা সময় নিল। তারপর এরিখকে রিভলভার নামাবার জন্য ইশারা করে টেবিল থেকে টেলিফোনটা তুলে বলল, 'আন্টনকে দাও।'

এর পরে টেলিফোনে যা কথা হল তা থেকে বুঝলাম যে, আন্টন নামধারী ব্যক্তিটিকে বলা হয়েছে স্টাইনারদের পলায়নের পথে বাধার সৃষ্টি না করতে।

টেলিফোন নামিয়ে রেখে গোয়রিং টেবিলেই রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে সেটা হাতে করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

www.BDeBooks.Com

'দাও, তোমার ট্যাবলেট দাও। তবে দুটো নয়, চারটে।'

আমি ব্যাগ খুলে শিশি থেকে চারটে বড়ি বার করে গোয়রিং-এর হাতে দিলাম। গোয়রিং সেগুলো একবারেই গিলে ফেলল।

আমি বললাম, 'এবার আমার ছুটি তো?'

'মোটেই না!' জলদ্‌গম্ভীর কণ্ঠে বলল গোয়রিং।

'মানে?'

'অত সহজে ছুটি পাবে না তুমি। দু' দিনের মধ্যে যদি দেখি, আমি আর ঘামছি না, তা হলে বুঝব তোমার ওষুধে কাজ দিয়েছে। দু' দিনের পর তোমার বড়ির কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করা হবে। যদি—'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'অ্যানালিসিস লন্ডনেই হয়ে গেছে; তাতে জানা গেছে যে, বড়িতে একটা বিশেষ উপাদান রয়েছে, যেটাকে আইডেনটিফাই করা যাচ্ছে না। অতএব—'

এবার গোয়রিং বাধা দিল আমাকে।

'ব্রিটিশরা নিপাত যাক! আমাদের ল্যাবরেটরির সঙ্গে লন্ডনের ল্যাবরেটরির তুলনা করছ তুমি?'

'যদি সেই অচেনা উপাদানকে তোমাদের ল্যাবরেটরি চিনতে পারে, তা হলে কী করবে তুমি?'

'কৃত্রিম উপায়ে এই বড়ি তৈরি করাব।'

'তারপর বাজারে ছাড়বে?'

'মোটেই না! এ ওষুধ ব্যবহার করবে শুধু আমাদের পার্টির লোক। যারা পার্টির মাথায় রয়েছে তারাও নানান রোগে ভুগছে। প্রত্যেক বক্তৃতার পর হিটলারের রক্তের চাপ মারাত্মকভাবে বেড়ে যায়। গোয়বেল্‌সের ছেলেবেলায় প্যারালিসিস হয়েছিল, তাই সে খুঁড়িয়ে চলে। পার্টির প্রচারসচিবের পক্ষে সেটা অশোভন; ওকে সোজা হাঁটতে হবে। হিমলারের হিস্টিরিয়া আছে, আর সে মাথার যন্ত্রণায় ভোগে। ... কাজেই ল্যাবরেটরির রিপোর্ট যদ্দিন না আসে, তদ্দিন তোমাকে এখানে থাকতে হবে। ইয়ে—তুমি ব্রেকফাস্ট করে এসেছ?'

'না।'

'আমি শার্ট বদল করতে একটু ওপরে যাচ্ছি; আমার লোককে বলে দিচ্ছি তোমায় ব্রেকফাস্ট এনে দেবে।'

গোয়রিং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কে জানত, বার্লিনে এসে এদের খপ্পরে পড়তে হবে? সন্ডার্সকে যে খবর দেব তারও উপায় নেই। কবে যে ফিরতে পারব তাও জানি না। সবচেয়ে খারাপ লাগছিল এটা ভাবতে যে, যদি এরা সেই অজ্ঞাত উপাদানকে চিনে ফেলতে পারে, তা হলে আমার সাধের স্বর্ণপর্ণী দুর্বৃত্ত নাৎসি নেতাদের রোগ সারানোর কাজে ব্যবহার হবে।

এইসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এরিখের দিকে চোখ পড়তে দেখি, সে ভারী অদ্ভুতভাবে আমার দিকে চেয়ে আছে—ভাবটা যেন, সে একটা কিছু বলতে চায়। এবং তার জন্য সাহস সঞ্চয় করছে।

দুজনে চোখাচোখি হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই এরিখ চেয়ার থেকে উঠে কেমন যেন অনুনয়ের দৃষ্টি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার, এরিখ?'

'হের্ প্রোফেসর,' কাতরকণ্ঠে বলল এরিখ, 'আজ একমাস হল আমার এক ব্যারাম দেখা

www.BDeBooks.Com

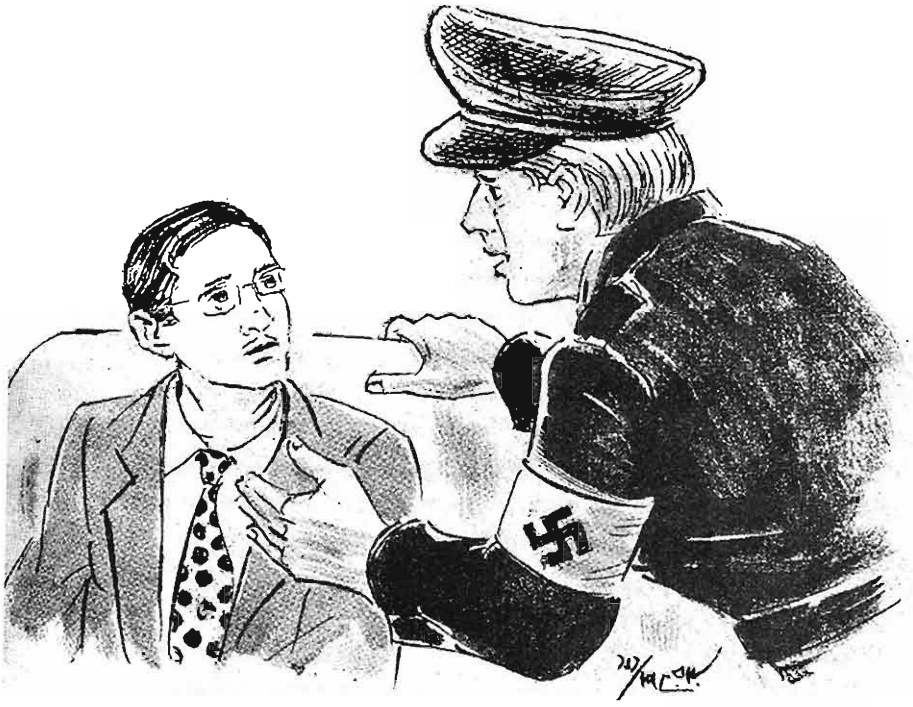

দিয়েছে, যার ফলে হয়তো আমার চাকরি আর থাকবে না।'

'কী ব্যারাম ?'

'এপিলেপ্‌সি।'

মৃগী রোগ। বিশ্রী ব্যারাম। আচমকা আক্রমণ করে। আর তার ফলে মানুষ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

'তিনবার এটা হয়েছে আমার', বলল এরিখ।

'কিন্তু কপালজোরে কাজের সময় হয়নি। ডাক্তার দেখিয়েছি, ওষুধ খাচ্ছি। কিন্তু সারতে নাকি সময় লাগবে। দুশ্চিন্তায় রাত্রে আমার ঘুম হচ্ছে না। দোহাই প্রোফেসর, তুমি ছাড়া আমার গতি নেই।'

ব্ল্যাক্‌শার্টের এই দশা দেখে আমার হাসিও পেল, মায়াও হল। শিশি আমার পকেটেই ছিল, দুটো বড়ি বার করে এরিখকে দিলাম।

'ফিয়ের, বিটে, ফিয়ের !'

এও চারটে চাইছে !

দিলাম দিয়ে আরও দুটো। এরিখ সেগুলো গিলে আন্তরিকভাবে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

গোয়রিং শার্ট বদলাতে গেছে। কতই বা সময় লাগবে ? দশ মিনিট ? আমি সোফায় হেলান দিয়ে বসে বাঁ পাটা ডান পায়ের উপর তুলে দিয়ে প্লাস্টারের নকশা করা সিলিং-এর দিকে চেয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টার কথা ভাবতে লাগলাম। কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ! অ্যাদ্দিন যা খবরের কাগজের পাতায় পড়েছি, এখন তার সবই দেখছি চোখের সামনে।

সময় আছে দেখে সুটকেস থেকে আমার নোটবইটা বার করে বার্লিনের ঘটনা লিখতে শুরু করলাম। বোম্বাই থেকে জাহাজে ওঠার সময় থেকেই আমি ডায়রি লিখতে শুরু করেছি।

খানিকটা লিখে একটা অদ্ভুত শব্দ পেয়ে থেমে গেলাম।

আমার দৃষ্টি এরিখের দিকে ঘুরে গেল। তার মাথা নুইয়ে পড়েছে বুকের উপর। শব্দটা হচ্ছে তার নাক ডাকার। বোঝো! এমন কর্তব্যনিষ্ঠ সদা তৎপর পুলিশ, সে কিনা আমাকে পাহারা দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়ল! গোয়রিং এসে দেখলে তো তুলকালাম কাণ্ড হবে!

কিন্তু গোয়রিং আসবে কি? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে যে, চারটে বড়ি ওভার ডোজ হয়ে গেছে, এবং প্রয়োজনের বেশি খাওয়ার একটা ফল হচ্ছে প্রথম অবস্থায় ঘুমে ঢলে পড়া। আমি যে এতদিন দুটো দিয়ে এসেছি সেটা তো আন্দাজে, আর প্রথম ব্যারামে দুটোতেই কাজ দেওয়াতে প্রতিবারই দুটো দিয়েছি।

আরও পাঁচ মিনিটে আমার দিনলিপি শেষ করে আমি উঠে পড়লাম। এরিখের নাসিকা গর্জন এখন আগের চেয়েও বেড়েছে। গোয়রিং যখন এখনও এল না, তখন আমার ধারণা বদ্ধমূল হল যে, সেও ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরোলাম। বড় হলটায় পা দিতেই দেখলাম একটি চাকর ব্রেকফাস্টের ট্রে হাতে করে আমারই দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে ঘরের বাইরে দেখে একটু অবাক হয়েই সে বলল, 'ইর ফ্র্যুস্টুক, হের প্রোফেসর।'—ফ্রুস্টুক হল ব্রেকফাস্ট।'

আমি বললাম, 'তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু তোমার মনিবের কেন এত দেরি হচ্ছে বলতে পার?'

'ইয়া, ইয়া।'

'কেন?'

'এর শ্লেফ্‌ট।'—অর্থাৎ তিনি ঘুমোচ্ছেন। অর্থাৎ আমার ধারণা নির্ভুল।

আমি চাকরকে বললাম ব্রেকফাস্ট টেবিলের উপর রেখে দিতে। চাকর ট্রে সমেত রিসেপশন রুমে ঢুকে গেল।

কপালজোরে এই সুযোগ জুটেছে। এটার সদ্ব্যবহার না করলেই নয়।

আমি হল থেকে বেরিয়ে বাইরে এলাম।

ওই যে ডাইমলার দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ির চালক পকেটে হাত দিয়ে তার পাশে পায়চারি করছে।

আমি এগিয়ে গেলাম। কী করব তা স্থির করে ফেলেছি।

আমায় আসতে দেখে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে পড়ল। পকেট থেকে তার হাত দুটো বেরিয়ে এল। সে অবাক হয়েছে। আমার আসাটা তার হিসেবের বাইরে।

আমি এগিয়ে গিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে বার্লিন নিয়ে চলো। যেখান থেকে এসেছি সেখানে।'

ড্রাইভার হাঁ- হাঁ করে উঠল।

'নাইন! ইখ্ কান এস্ নিখ্‌ট!'—না, আমি তা করতে পারি না।

'এবার পার?'

আমি পকেট থেকে সন্ডার্সের দেওয়া লুগার অটোম্যাটিকটা বার করে ড্রাইভারের দিকে উঁচিয়ে ধরেছি।

ড্রাইভারের মুখ মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'ইয়া, ইয়া, ইয়া!'

ড্রাইভার নিজেই দরজা খুলে দিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে সতেরো নম্বর ফ্রীডরিখস্ট্রাসেতে

www.BDeBooks.Com

পৌঁছে গেলাম।

স্টাইনার পরিবারের তিনজনই আমার জন্য গভীর উৎকণ্ঠায় সময় কাটাচ্ছিল। প্রোফেসর স্টাইনার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। নরবার্ট বলল, 'কী ব্যাপার ? কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তোমাকে ?'

আমি সংক্ষেপে ঘটনাটা বলে বললাম, 'তোমরা এক্ষুনি তোড়জোড় শুরু করো। কালই প্যারিস চলে যাও। কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। আমি আজই বিকেলের প্লেনে লন্ডনে ফিরে যাব। নরবার্ট, তুমি দয়া করে বুকিং-এর ব্যবস্থাটা করে দাও।'

বিকেলে চারটের ফ্লাইটে উড়ন্ত প্লেনে বসে বুঝলাম, মনের মধ্যে দুটো বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব চলেছে। অন্তত একটা ইহুদি পরিবারকে নাৎসি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি বলে যেমনই আনন্দ হচ্ছে, তেমনই অভক্তি হচ্ছে ভেবে যে, আমার ওষুধের ফলে দুটি নরপিশাচ ব্যারামের হাত থেকে রেহাই পেল।

সন্ডার্স ভাবতে পারেনি আমি এত তাড়াতাড়ি ফিরব। বার্লিনে কী হল জানবার জন্য সকলেই উৎসুক। 'তোমার যাত্রা সফল কি না সেটা আগে বলো।'

আমি বললাম, 'একদিক দিয়ে অভাবনীয়ভাবে সফল। স্টাইনার সুস্থ এবং তাদের সমস্ত সমস্যা দূর।'

'ব্রাভো !'

'কিন্তু সেইসঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আছে, যেটা শুনে তুমি মোটেই খুশি হবে না।'

'কী ?'

'তোমার অনুমানে ভুল ছিল না, সন্ডার্স !'

'তোমাকে নাৎসিদের খপ্পরে পড়তে হয়েছিল ?'

'হ্যাঁ।'

আমি ব্ল্যাক্‌শার্ট-গোয়রিং সংক্রান্ত ঘটনার একটা রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা দিয়ে বললাম, 'চারটে করে মিরাকিউরলের বড়ি যদি শুধু ওদের ঘুম পাড়িয়ে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দিত তা হলে কথা ছিল না। কিন্তু সেইসঙ্গে ওই দুই পাষণ্ডের দুই বিশ্রী ব্যারাম সারিয়ে দিল ভাবতে আমার মনটা বিষিয়ে উঠছে। তুমি বিশ্বাস করো, সন্ডার্স !'

কিন্তু এ কী ! সন্ডার্সের ঠোঁটের কোণে হাসি কেন ?

এবার সে তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমার অচেনা একটা শিশি বার করল, তাতে সাদা বড়ি।

'এই নাও তোমার মিরাকিউরল।'

'মানে ?'

'খুব সহজ। সেদিন তুমি আর ডরথি বেরোলে, আমি প্রবন্ধ লেখার জন্য রয়ে গেলাম। সেই ফাঁকে আমি তোমার বাক্স খুলে তোমার শিশি থেকে মিরাকিউরল বার করে তার জায়গায় অব্যর্থ ঘুমের ওষুধ সেকোন্যালের বড়ি ভরে দিয়েছিলাম। একসঙ্গে চারটে সেকোন্যালের বড়ি যে মারাত্মক ব্যাপার—দশ মিনিটের মধ্যে নিদ্রা অবধারিত !... মাই ডিয়ার শঙ্কু—তোমার মহৌষধ বিশ্বের হীনতম প্রাণীর উপকারে আসবে এটা আমি চাইনি, চাইনি, চাইনি !'

আমার মন থেকে সব অন্ধকার দূর হয়ে গেল। সন্ডার্সের হাতটা মুঠো করে ধরলাম—মুখে কিছু বলতে পারলাম না।

ইনটেলেকট্রন

এপ্রিল ৩

অনেকদিন পরে একটা নতুন জিনিস তৈরি করলাম। একটা যন্ত্র, যাতে মানুষের বুদ্ধি মাপা যায়। বুদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছুই বোঝায়। জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, সাধারণ বুদ্ধি বা কমনসেন্স, ভাল মন্দ বিচার করার ক্ষমতা ইত্যাদি সবই এরমধ্যে পড়ে। আমার অন্যান্য যন্ত্রের মতো এটাও খুবই সরল। যার বুদ্ধির পরিমাপ হবে তাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে মাথার দুপাশে হেডফোনের মতো দুটো ইলেকট্রোড লাগিয়ে দিতে হয়। সেই ইলেকট্রোডের তার একটা বাক্স জাতীয় জিনিসের গায়ে লাগানো হয়। সেই বাক্সের সামনেটা কাচে ঢাকা, সেই কাচের পিছনে দাগ কাটা আছে একশো থেকে এক হাজার পর্যন্ত। যন্ত্রটা মস্তিষ্কের সঙ্গে লাগিয়ে একটা বোতামে চাপ দিলেই একটা কাঁটা একটা বিশেষ নম্বরে গিয়ে দাঁড়ায়। সেই নম্বরটাই হল বুদ্ধির পরিমাপ। রীতিমতো বুদ্ধিমান লোকেদের সাতশো থেকে হাজারের মধ্যে নম্বর ওঠা উচিত, পাঁচশো থেকে সাতশো হল চলনসই বুদ্ধি, আর পাঁচশোর নীচে হলে আর সে লোককে বুদ্ধিমান বলা চলে না। আমি যন্ত্রটা স্বভাবতই প্রথমে নিজের উপর পরীক্ষা করে দেখি। নম্বর উঠল ৯১৭। তারপর বিকেলের দিকে অবিনাশবাবু এলেন। তাঁকে চেয়ারে বসিয়ে ইলেকট্রোড লাগিয়ে বোতাম টিপতে নম্বর উঠল ৩৭৭। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'ওতে কী হিসেব পেলেন ?' বললাম, 'আপনার বুদ্ধির হিসেব।'

'কেমন বুঝলেন ?'

'মোটামুটি যেমন ভেবেছিলাম তেমনই।'

'তার মানে বোকা ?'

'না না, বোকা হতে যাবেন কেন ? আপনার বইপড়া পাণ্ডিত্য যে নেই, সেটা নিশ্চয়ই আপনিও স্বীকার করবেন। তবে আপনার সাধারণ বুদ্ধি মোটামুটি আছে। আর সবচেয়ে যেটা বড় কথা, সেটা হল আপনি সৎ লোক। সেটা কম গুণ নয়।'

'এই সৎ লোকের হিসেবগুলি ওই যন্ত্রে পাওয়া যাচ্ছে ?'

'না। ওটা আমার সঙ্গে আপনার বিশ বছর পরিচয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।'

যন্ত্রটার নাম দিয়েছি ইনটেলেকট্রন। জুন মাসে হামবুর্গে আবিষ্কারক সম্মেলন বা ইনভেনটরস কনফারেন্স আছে, তাতে যন্ত্রটা নিয়ে যাব। তবে মুশকিল হবে এই যে অনেকেই নিজের বুদ্ধির পরিমাপ জানতে দ্বিধা করবে। একেবারে অঙ্কের সাহায্যে বুঝিয়ে দেওয়া কার কতটা বুদ্ধি আছে, এটা সকলে খুব ভাল চোখে দেখবে না। আর আমার যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করে কি না সেই নিয়েও অনেকে নিশ্চয়ই সন্দেহ প্রকাশ করবে। কিন্তু আমি জানি, এ যন্ত্রে কোনও ভুল নেই। আমার সব আবিষ্কারই এ পর্যন্ত ঠিকমতো কাজ করে এসেছে ; এটাও না করার কোনও কারণ নেই।

বিকেলে হঠাৎ নকুড়বাবু—নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস—এসে হাজির। ভদ্রলোকের সঙ্গ আমার

www.BDeBooks.Com

বেশ ভালই লাগে। আর মাঝে মাঝে সব অলৌকিক ক্ষমতার প্রকাশ এখনও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। যেমন বসবার ঘরের সোফাতে বসেই বললেন, 'আপনি তো জুন মাসে আবার বাইরে চললেন।'

'তা যাচ্ছি বটে, আপনার গণনায় ভুল নেই।'

'এবার কিন্তু আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।'

'কেন বলুন তো ?'

'না হলে আপনার বিপদ আছে।'

ভদ্রলোকের কথায় কখনও ভুল হতে দেখিনি, তাই চিন্তায় পড়ে গেলাম। অবিশ্যি ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি নেই, অসুবিধাও নেই—কারণ কনফারেন্সের তরফ থেকে সেক্রেটারির একটি করে টিকিট পাঠায়। সেটা আমার আর ব্যবহার করা হয় না—কিন্তু এবার নাহয় করব।

'আপনার বুদ্ধিনির্ধারণ যন্ত্রটা একবার দেখতে পারি কি ?'

এই প্রশ্নও ভদ্রলোকের ক্ষমতার একটা পরিচয়, কারণ ওঁকে আমি যন্ত্রটা সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। বললাম, 'নিশ্চয়ই—তবে সেটা আমি না এনে আপনি সেটার কাছে গেলে আরও সুবিধে হয়।'

নকুড়বাবু অবশ্যই রাজি। তাঁকে নিয়ে আমার ল্যাবরেটরিতে গেলাম। যন্ত্রটা নানা দিক থেকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'আমি একবার চেয়ারে বসব নাকি ?'

'বসুন না—তবে আপনার অলৌকিক বুদ্ধির পরিমাপ এতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।'

নকুড়বাবু বসলেন। কাঁটা উঠে ৫৫৭-তে থেমে গেল। বললাম, 'আপনি মোটামুটি বুদ্ধিমানদের দলেই পড়েন।'

ভদ্রলোক একপেয়ালা কফি খেয়ে উঠে পড়লেন।

'আমার ঠিকানা তো আপনার জানাই আছে। হামবুর্গ যাবার আগে খবরটা দেবেন। আমি সঙ্গে গেলে আপনার মঙ্গল হবে।'

—১৯৮৯

উপরে মুদ্রিত অসমাপ্ত গল্পের নামকরণ বাবা করেছিলেন—'ইনটেলেকট্রন'। একটি বাঁধানো রুলটানা কাগজের খাতায় (১১ ইঞ্চি × ৮ ½ ইঞ্চি) খসড়াটি পাওয়া গেছে। এটি সম্ভবত ১৯৮৯-এর জুন মাসে লেখা। ওই একই মাসে তিনি শেষ করেছিলেন 'ডাক্তার নন্দীর [মুন্সীর] ডায়রি' ও 'গোলাপি মুক্তা রহস্য'। 'ইনটেলেকট্রন' পরে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

সন্দীপ রায়
৩০/৬/৯২

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী, ১৩৯৯

ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা

১৬ই অক্টোবর

আজ আমার পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল। সকালে অবিনাশবাবু এসেছিলেন, আমার হাত দুটো ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'মেনি হ্যাপি ডেজ অফ দ্য রিটার্ন।' ভদ্রলোকের হাবভাব এতই আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল যে আমি আর ইংরিজিটা সংশোধন করলাম না।

দেশবিদেশ থেকে বহু বিজ্ঞানী বন্ধুরা আমায় অভিনন্দন জানিয়েছে। আমার সামনেই টেবিলে রাখা রয়েছে অন্তত খানপঞ্চাশেক চিঠি, টেলিগ্রাম আর গ্রিটিংস কার্ড। এখনও কাজ করতে পারছি—সেটাই বড় কথা। তার একটা কারণ অবশ্য মিরাকিউরল, আর আরেকটা আমার চাকর প্রহ্লাদের একনিষ্ঠ পরিচর্যা। সেও অবিশ্যি আমার মিরাকিউরলের সুফল ভোগ করেছে, যেমন করেছে আমার বেড়াল নিউটন। গত পঞ্চাশ বছরে মিরাকিউরল থেকে শুরু করে কত কী যে আবিষ্কার করেছি, সেই কথাই ভাবছিলাম। অ্যানাইহিলিন পিস্তল, ঘুমের বড়ি সমনোলিন, লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য রিমেমব্রেন, ল্যাম্পের জোরালো আলো ল্যুমিনিম্যাক্স, শ্যাঙ্কোপ্লাস্ট, শ্যাঙ্কোপ্লেন, কানে শোনা যায় না এমন শব্দ শোনার জন্য মাইক্রোসোনোগ্রাফ—আরও কত কী!

এইসব ভাবছি এমন সময় প্রহ্লাদ এসে খবর দিল, একজন সাহেব দেখা করতে এসেছেন।

আমি আসতে বলাতে যিনি প্রবেশ করলেন তার বয়স পঁচিশের বেশি নয়। আমার সঙ্গে করমর্দন করে ছেলেটি বলল, 'আমার নাম চার্লস ড্রেক্সেল। আমার বাবার নাম হয়তো তুমি—'

'জন ড্রেক্সেল কি? বায়োকেমিস্ট?'

'হ্যাঁ। আমি বাবার ব্যাপারেই তোমার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।'

'তোমার বাবা এখন কোথায়?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপে একটা এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। তিন দিন হল তাঁর মৃত্যু হয়।'

'সে কী! এ যে ভয়ংকর সংবাদ। ব্যাপারটা শুনি।'

'বলছি। পুরো ব্যাপারটাই বলছি, একটু ধৈর্য লাগবে।'

'ধৈর্যের কোনও অভাব নেই আমার।'

'বাবা শুধু বিজ্ঞানীই ছিলেন না—তিনি পর্যটকও ছিলেন। দু বছর আগে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর একটি আরবি পুঁথির সন্ধান পান। বাবা আরবি জানতেন। অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য পুঁথি। সেটা পড়ে তিনি প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত হয়ে পড়েন। বলেন, এই পুঁথিতে পৃথিবীর সুন্দরতম জিনিস আবিষ্কারের পদ্ধতির বর্ণনা আছে।'

'সেটা কী জিনিস?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'তাও বাবা বলেননি। বললেন, এক্সপেরিমেন্ট সফল হলে লোকে এমনিই জানতে

www.BDeBooks.Com

পারবে।'

'তারপর ?'

'তারপর বাবা এক্সপেরিমেন্টের তোড়জোড় শুরু করেন। ব্যয়সাপেক্ষ এক্সপেরিমেন্ট—শহরে করা চলবে না—প্রাকৃতিক পরিবেশ চাই। বাবা ব্যাপারটাকে গোপন রাখার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ বেছে নেন। কোনও সংস্থা বাবাকে টাকা দিতে রাজি হয়নি। অবশেষে জোসেফ গ্রিমাল্ডি নামে বাবার এক পরিচিত ধনী বায়োকেমিস্ট, বাবাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে এবং এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করতে রাজি হন। গ্রিমাল্ডির শর্ত ছিল, পরীক্ষা সফল হলে তার জন্য অর্ধেক কৃতিত্ব সে দাবি করবে। বাবা তখন এমনই মেতে উঠেছেন যে, এই শর্তে তিনি রাজি হয়ে যান। তিন মাস আগে এই এক্সপেরিমেন্ট শুরু হয়। চিঠিতে জানতে পারতাম বাবা দ্রুত সফলতার দিকে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। গ্রিমাল্ডির চিঠি এল যে, মাত্র চার দিনের অসুখে কোনও অজ্ঞাত ট্রপিক্যাল ব্যারামে বাবার মৃত্যু হয়েছে। বিজ্ঞানীর দল যে যার দেশে ফিরে গেছে অথচ বাবার শেষ চিঠিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল যে, এক্সপেরিমেন্ট সফল হতে চলেছে।'

'তোমার বাবার মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার নিজের কোনও ধারণা আছে ?'

'আছে।'

'কী ?'

'গ্রিমাল্ডি এক্সপেরিমেন্টের পুরো ক্রেডিট নেবার জন্য বাবাকে খুন করেছে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছ কেন ?'

'আমি চাই, তুমি ওই দ্বীপে গিয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করো। এই ধরনের অভিযান তো তোমার কাছে নতুন কিছু নয়। তোমার দল নিয়ে তুমি চলে যাও। বাবার কাজটা অসম্পূর্ণ থাকলে বিজ্ঞানের পরম ক্ষতি হবে। দ্বীপের অবস্থান আমার জানা আছে, আমি তোমাকে জানিয়ে দেব।'

—১৯৯১

একই আকারের অপর একটি বাঁধানো খাতায় ১৯৯১-এর জুন মাসে লেখা 'ড্রেক্সেল আইল্যান্ডের ঘটনা'-র অসমাপ্ত খসড়াটি পাওয়া গেছে। বাবা গল্পটি পর পর মোট তিন বার লেখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই তা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ খসড়াটি এখানে প্রকাশ করা হল।

সন্দীপ রায়
৩০/৬/৯২

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৯৯